প্রকাশনা

নরসুন্দর মানুষ নির্মিত

জীববিবর্তন তত্ত্বঃ নানা জিজ্ঞাসা

অনন্ত বিজয় দাশ

জীববিবর্তন তত্ত্বঃ নানা জিজ্ঞাসা

অনন্ত বিজয় দাশ

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

জীববিবর্তন তত্ত্বঃ নানা জিজ্ঞাসা

অনন্ত বিজয় দাশ

ইস্টশন প্রকাশ: মার্চ, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ:
গুগোল অবলম্বনে
নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

JibBiborton Totto: Nana Jiggasa. by Aanata Bijoy Das

Istishon eBook
eBook Published in **March, 2017**
Created by: NoroSundor Manush

অনন্ত বিজয় দাশ

(১৯৮২-২০১৫)

এই ইবুক সংস্করণটি লেখকের স্মৃতির প্রতি নিবেদিত

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

ওনলি অ্যা থিওরি!

অনেক সময় বলতে শোনা যায় "'প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীববিবর্তন' জীববিজ্ঞানের নিছক (mere) একটি 'তত্ত্ব' (থিওরি) মাত্র, এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।" (১) বিজ্ঞানে কোনো তত্ত্বের 'বাস্তব ভিত্তি' বা ফ্যাক্ট আছে কি নেই, বুঝতে হলে প্রথমে বিজ্ঞানে তত্ত্ব কিভাবে গঠিত হয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাজ কি-সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। প্রায়শ আমরা যেভাবে সাদামাটা অর্থে 'তত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি (যেমন কারো ব্যক্তিগত ধারণা, অনুমান, বিশ্বাসকে বোঝাতে), বিজ্ঞানে কিন্তু মোটেও সেরকমভাবে হাল্কা মেজাজে 'তত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। বিজ্ঞানে 'তত্ত্ব' শব্দটির অর্থ বেশ গভীর। অনেক সময় আমরা বলে থাকি, 'বাংলাদেশের অমুক অঞ্চলের মানুষগুলো বড় বাজে, হাড়কিপ্টে। তাদের সাথে সম্পর্ক করা ভালো না।' 'সাদাদের তুলনায় কালো মানুষেরা বেশি বদমেজাজি, রাগী, খিটখিটে হয়' কিংবা 'মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি মেধাবী হয়।' উক্ত উদাহরণগুলির কোনোটিই পরীক্ষিত-প্রমাণিত কোনো বক্তব্য নয়; যেনতেন অনুমান, লোককথা, আর stereotype মানসিকতায় আচ্ছন্ন বক্তব্য। বিজ্ঞান মোটেও লোককথা, stereotype বক্তব্য, যেনতেন অনুমানকে 'থিওরি' বা 'তত্ত্ব' বলে গ্রহণ করে না। বিজ্ঞান গবেষণা-পরীক্ষণ-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে 'অনুকল্প' (hypothesis) গঠন। সেটা নতুন তত্ত্ব গঠনের জন্য হতে পারে অথবা পুরাতন তত্ত্বকে সময়ের পরিবর্তনে নতুন করে ঝাচাই করে নেয়ার জন্য হতে পারে। অনুকল্প গঠনের কিছু আবশ্যিক পূর্বশর্ত আছে :যেমন 'অনুকল্পটি অবশ্যই বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট ধারণা হতে হবে, সুনির্দিষ্ট হতে হবে,

প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ-বিশ্লেষণ-যাচাইযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ধারণার প্রকাশক হতে হবে ইত্যাদি।' উক্ত পূর্বশর্তগুলি পূরণ করে অনুকল্প গঠিত হলে এরপর অনুকল্পের অন্তর্ভুক্ত ঘটনা বা বিষয়গুলিকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। সন্দেহাতীতভাবে উক্ত বিষয় বা ঘটনাগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হলে তবেই অনুকল্পটি 'তত্ত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি পায়; নয়তো অনুকল্পটি খারিজ হয়ে যায়।

কেবল কিছু ঘটনা বা বিষয়কে জানা বা চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞানে 'তত্ত্ব' গড়ে ওঠে না। যেমন পৃথিবীর সাথে চন্দ্রের দূরত্ব কত, সূর্যের দূরত্ব কত, পৃথিবীর বয়স কত, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্য কি কি ইত্যাদি। রসায়নবিজ্ঞানে Atomic Theory বলতে কেবল বুঝায় না যে শুধু এটম বা পরমাণুর অস্তিত্ব রয়েছে; বরং কেমন করে-কিভাবে পরমাণুগুলো একে-অপরের সাথে ক্রিয়াশীল হয়, কিভাবে পরমাণুগুলো একত্রে মিলে যৌগ গঠন করে, রাসায়নিকভাবে পরমাণুগুলোর আচরণ কেমন ইত্যাদি বিষয়গুলো এই থিওরির আলোচ্য বিষয়। তারমানে বিজ্ঞান স্পষ্টই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির (Nature of Science) সাথে সম্পর্কিত। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি হচ্ছে মূলত বৈধ-প্রমাণের বৈশিষ্ট্য (the criteria of valid evidence), অর্থবোধক গবেষণা নক্সা (the design of meaningful experiments), সম্ভাবনার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় (the weighing of possibilities), গবেষণার জন্য গৃহীত অনুকল্পগুলোর পরীক্ষণ (the testing of hypothesis),উপযোগী তত্ত্ব গঠন (the establishment of useful theory) ইত্যাদি-যা এই পার্থিব জগতের কোনো নির্দিষ্ট ফেনোমেনা বা ঘটনা সম্পর্কে যথার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং অর্থবোধক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে।(২)

বিজ্ঞানে তত্ত্বের কাজ কি? বিষয়টি বুঝার জন্য আমরা উদাহরণ হিসেবে নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বকে বিবেচনায় নিই। নিউটনের জন্মের অনেক আগে থেকে (খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দে প্লেটোর যুগেও) মানুষের জানা ছিল কোনো বস্তু উপরের দিকে ছেড়ে

দিলে তা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। কিন্তু কেন এমনটা ঘটে, তা মানুষের জানা ছিল না। নিউটন জানালেন, 'ভর ভরকে আকর্ষণ করে'। তিনি আরো জানালেন, অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সবকিছুকে তার কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে। গাছ থেকে আম-জাম-কাঁঠাল-কলা পড়লে কোনো কিছুই আর শূন্যে ভেসে থাকে না, মাটিতে পড়ে যায়। উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়লে তা মাটিতে নেমে আসে। নিউটনের এ অনুকল্পটি বিভিন্নভাবে-বিভিন্ন সময়ে প্রমাণিত হয়েছে; ফলে অনুকল্পটি ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক মহলে 'তত্ত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। নিউটনের এ তত্ত্ব দ্বারা আমরা পৃথিবীর একটি বাস্তবতা 'অভিকর্ষ বল'-এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারি। আবার জৈবযৌগ-অজৈবযৌগ হচ্ছে পৃথিবীর বাস্তবতা, সেই জৈবযৌগ-অজৈবযৌগের গঠন, রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ইত্যাদি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারছি এটমিক থিওরি দ্বারা। অর্থাৎ বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্য (Data) আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হচ্ছে, পৃথিবীর সেই তথ্যের ব্যাখ্যা(৩)। আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায়, 'যে অনুকল্পটি সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে, সেই অনুকল্পকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়।' কিছু বাস্তবতা আছে, আমরা সরাসরি উপস্থিত হয়ে চাক্ষুস অবলোকন করতে পারি না বা সম্ভবও না,যেমন পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলি যেমন সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে সৌরজগতে ঘূর্ণায়মান রয়েছে; যা সরাসরি উপস্থিত থেকে চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয় একটি নক্ষত্রকে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হওয়া প্রত্যক্ষ করা। কিংবা একজন ভূতাত্ত্বিকের পক্ষে সম্ভব নয় পৃথিবীর কেন্দ্রের গঠন দেখে আসা। অর্থাৎ, পৃথিবীর সব বাস্তবতা এক রকম নয়; কোনোটা চাক্ষুস দেখা যায়, কোনোটা চাক্ষুস দেখা যায় না। বিজ্ঞানও তত্ত্ব গঠনের জন্য শুধুমাত্র গবেষণা পদ্ধতি 'সরাসরি উপস্থিত হয়ে বাস্তবতা প্রত্যক্ষণের' উপর নির্ভরশীল নয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোথাও ডিডাকটিভ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, কোথাও ইনডাকটিভ পদ্ধতি। আবার কোনো বিজ্ঞানী বা গবেষক মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ যোগ্যতার (Falsifiability)-এর উপর গুরুত্ব প্রদান করেন,

ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞানে কোথাও অপ্রমাণিত অনুমান বা অনুকল্পকে পরীক্ষণ-বিশ্লেষণ ব্যাতিরেকে মেনে নেওয়া হয় না, 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

১৮০৮ সালে জন ডাল্টন A New System of Chemical Philosophy গ্রন্থে পরমাণুর গঠন নিয়ে প্রথম অনুকল্প প্রদান করেন, ১৮১১ সালে এভোগ্রেড্রো উক্ত অনুকল্পে কিছু সংশোধনী আনেন। ১৯০4 সালে জে. জে. থমসন বলেন, পরমাণুর ভেতর ধনাত্মক আধানকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন পরিভ্রমণরত। ১৯০৯ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন এবং এর পরে নীল্স বোর ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের গতিপথ সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৯৩২ সালের দিকে জেমস চ্যাডউইক পরমাণুর ভর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এটমিক অনুকল্পটি প্রমাণিত হয় কিন্তু তখন পর্যন্ত কারও পক্ষে পরমাণুর গঠন 'চাক্ষুস' অবলোকন করা সম্ভব হয় নি। রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিৎ হয়েছিলেন বলেই বিজ্ঞানীরা এটমিক থিওরি মেনে নিয়েছিলে। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে শক্তিশালী স্কেনিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর ছোট ছোট বলের মতন পরমাণুর অস্তিত্ব চাক্ষুস দেখা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের এই চিরচেনা জগতের 'বাস্তবতা' কি কি? এককথায় ক্রম পরিবর্তনশীলতা; নিয়মিত পরিবর্তন এবং অনিয়মিত পরিবর্তন। নিয়মিত পরিবতর্নের উদাহরণ হচ্ছে, নিজ অক্ষে পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবীতে দিন-রাতের পরিবর্তন, জোয়ার-ভাঁটা, চন্দ্রগ্রহণের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠে জলের উচ্চতা বৃদ্ধি, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে ঋতুর পরিবর্তন, ইত্যাদি। অনিয়মিত পরিবর্তনের উদাহরণ হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে টেকটনিক প্লেটগুলোর অবস্থান পরির্তন, মরুকরণ, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভার মাধ্যমে পরিবেশের পরিবর্তন, বরফ যুগের আবির্ভাব, ইত্যাদি। জীবজগতের বাস্তবতা হচ্ছে-সকল জীবের বংশবৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি, যেমন : 'আমাদের বাসা-বাড়িতে যে মাছি (Musca domestica) সাধারণত দেখা যায়, এর জীবনচক্র বা প্রজন্মকাল ২৩ দিনের। ছয়টি ব্যাচে মাছি ডিম পাড়ে।

প্রতিটি ব্যাচে থাকে ১২০-১৫০টি ডিম। এই হিসেবে একটি স্ত্রীমাছির সব বংশধরেরা বেঁচে থেকে যদি নতুন বংশধর রেখে যেতে পারে, তবে এক বছরের মধ্যেই মোট মাছির সংখ্যা দাঁড়াবে ১৯১×১০১৮। একটি ঝিনুক বছরে ১০০ মিলিয়ন ডিম ছাড়তে পারে। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ বছরে ২৮ মিলিয়ন ডিম পাড়ে। অন্য জাতের কোনো কোনো মাছ অবশ্য অনেক কম ডিম ছাড়ে। তাও বছরে ১.৭ মিলিয়ন হতে পারে। প্রতিটি তারা মাছ (Piaster oraceous) এক বছরে ৫০ মিলিয়ন ডিম ছাড়ে। উল্লেখ্য তারা 'মাছ' বলে ডাকলেও এটি 'মাছ' নয়, অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এক ধরনের ব্যাঙ (Bull frog) বছরে ২০,০০০ ডিম পাড়ে। অন্যান্য ব্যাঙ কম করে হলেও বছরে এক হাজার ডিম পাড়ে। একটি অর্কিড গাছ থেকে বছরে এক মিলিয়ন বীজ উৎপন্ন হতে পারে। পৃথিবীতে যেসব জীবের প্রজনন হার অত্যন্ত কম, তার মধ্যে হাতি একটি। যদি সমস্ত প্রজন্মের সমস্ত হাতি সফলভাবে বংশরক্ষা করে যায়, তাহলে এক জোড়া হাতি থেকে ৭৫০ বছরে শুধু হাতির জনসংখ্যা হবে এক কোটি নব্বই লক্ষ(৪)।'কিন্তু প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য জীবের খাদ্য, বাসস্থান, সঙ্গী, আনুসাঙ্গিক চাহিদা পূরণের অবলম্বনগুলোর বৃদ্ধির হার এতোটা নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সকল জীবকে টিকে থাকার জন্য (মানে বেঁচে থাকার জন্য চাহিদা পূরণ করতে) নিজেদের অজান্তে জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়। জীবজগতের এই বাস্তবতা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। ডারউইন জীবের জীবন রক্ষার সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া কিংবা অত্যাধিক বংশবৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ থাকার জন্য কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন, যেমন খাদ্য সংকট, শত্রুর সাথে লড়াই, আবহাওয়া-ভূপ্রকৃতি-পরিবেশের ক্রমপরিবর্তন ইত্যাদি। প্রতিটি জীবের এ জীবন সংগ্রামকে তিনটি ধারায় পরিচালিত হতে দেখা যায়: প্রথম, আন্তঃপ্রজাতি মানে একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে, দ্বিতীয়, একই ভৌগলিক এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে, এবং তৃতীয়, জীবন ধারণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে। ডারউইনের মতে তিন ধরনের সংগ্রামের মধ্যে সবচেয়ে তীব্রতর সংগ্রাম হচ্ছে একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যেকার সংগ্রাম।

যৌন-প্রজননশীল জীবে মাইয়োসিস প্রক্রিয়ায় 'জনন কোষ' বিভাজনের সময় জিনের মিউটেশন (Mutation) বা ক্রোমসোম মিউটেশনের মাধ্যমে প্রকরণ (Variation)-এর উদ্ভব একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজাতির সদস্যরা সকলে দেখতে অবিকল এক রকম হয় না (অবিকল যমজ বাদে)। সামান্যতম হলেও তাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত বিভিন্নতা থাকে হতে পারে দৈহিক চেহারায় (ফর্সা, কালো, দাগযুক্ত, দাগ ছাড়া), আকৃতিতে (লম্বা, বেঁটে, মাঝারি) কিংবা অন্য কোনোভাব। যেমন প্রজাপতির একই বংশধরদের মধ্যে কারো গায়ে ফুটকিযুক্ত দাগ বেশি, কারো কম, কেউবা ধূসর বর্ণের, কেউবা বেশি রঙিন, ইত্যাদি।

টিকে থাকার জন্য সকল জীবই নিজেদের অজান্তে প্রতিযোগিতায় শামিল হয়, পরিবর্তিত পরিবেশে ঐসব ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণগুলির কোনো কোনোটি যদি পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটাতে সুবিধাজনক হয়ে দেখা দেয় তবে ঐ জীবেরা 'জীবন সংগ্রামে' টিকে যায়। অধিক হারে বংশধর রেখে যেতে পারে। কিন্তু যেসব জীবের প্রকরণগুলো পরিবেশের সাথে অনুকূল নয় (যেমন রঙের ভ্যারিয়েশনের কারণে অনেক প্রাণী ক্যামোফ্লেজ করে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, আবার অনেকে উজ্জ্বল বর্ণের কারণে সহজেই শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যায়), তারা জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে না,তাদের নির্বিশেষে বিলুপ্তি ঘটে। জীবের জীবন রক্ষার সংগ্রামে সফল হওয়ার অর্থ শুধু জীবের নিজের বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়, সফলভাবে নিজের বংশধর টিকিয়ে রেখে বংশরক্ষা করাটাও অত্যন্ত জরুরি।

একটি আম গাছে মুকুল ধরে হাজার-হাজার, সেই মুকুলের অনেকাংশ ঝরে পড়ে যায় ঝড়-বৃষ্টির কারণে। তারপর আবার পোকার আক্রমণের কারণে মুকুলের পরিমাণ আরো কমে যায়, যে সংখ্যক মুকুল থেকে আম ধরে, সেগুলিও ঝড়-বৃষ্টির কারণে বড় হবার আগেই ঝড়ে যায়, পোকার আক্রমণেও মরে যায় অনেকগুলো। আম গাছে যে পরিমাণ মুকুল ধরে, সে তুলনায় গাছে আম হয় অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণ; এবং এই নগণ্য পরিমাণ আমের বীজ থেকে নতুন আমের চারা হয় আরো অনেক কম

পরিমাণ। একটি মাছের পেটে যে পরিমাণ ডিম থাকে তার বেশিভাগই ডিম ছাড়ার পর শিকারী মাছের খাবারে পরিণত হয়, পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে অনেক ডিম উর্বর হতে পারে না, এমন কী স্রোতেও প্রচুর ডিম নষ্ট হয়ে যায়। যে পরিমাণ ডিম থেকেও মাছের পোনা হয় তারও একটা বড় অংশ আবার বড় মাছের খাদ্যের শিকার হয়, যে পোনাগুলি শেষমেশ বেঁচে থাকতে পারে শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, তাদের মধ্যেও বড় হবার সাথে সাথে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের সংস্থান করা, শত্রু মাছের নজর এড়িয়ে টিকে থাকা, সঙ্গী নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে জীবন সংগ্রাম চলতে থাকে। বলা যায়, জীবজগতের নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা। জীবের বংশবৃদ্ধির অত্যাধিক প্রবণতার কারণে বিপুল সন্তান জন্ম দিলেও প্রত্যেকটি প্রজাতির জীবসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে না। ডারউইন 'অরিজিন অব স্পিসিজ' গ্রন্থে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রক্রিয়ায় জীবজগতের এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। জীববিজ্ঞানে আর এমন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই,যা জীবজগতের এ বাস্তবতাগুলোকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। জীবজগতে খাদ্যের জন্য, বাসস্থানের জন্য, সঙ্গী নির্ধারণের জন্য, বংশ রক্ষার জন্য, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কেউবা অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে প্রকরণ থেকে, কেউবা পায় না। অতিরিক্ত সুবিধা পেলে ঐ প্রাণী কঠোর অস্তিত্বের সংগ্রামে উদ্বর্তিত হয়, নতুন বংশধর রেখে যেতে পারে। ডারউইন যাকে বলেছিলেন 'পরিবর্তনযুক্ত উত্তরাধিকার' (Descent with Modification)। দীর্ঘসময় ধরে প্রজন্মান্তরে এভাবে চলতে থাকলে একসময় 'পরিবর্তনযুক্ত উত্তরাধিকার' থেকে সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। নতুন প্রজাতির উৎপত্তিসহ সামগ্রিক প্রক্রিয়াটির নাম 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection)।

'চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ'-ছোটবেলায় আমরা সবাই এমনটাই আমরা পড়ে এসেছি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের 'প্রকৃতি' বলতে তা-ই আমাদের চারপাশের প্রাণীজগৎ-উদ্ভিদজগৎ, জড়জগৎ (চন্দ্র, সূর্য, আবহাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, ভূমি ইত্যাদি) সবকিছুই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। জীবজগৎ-জড়জগৎ একে

অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। নির্বাচন মানে কোনো কিছু বাছাইকরণ। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' শুধু আমাদের জীবজগতের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তনশীল উপাদানের প্রভাবে জীবজগতে যে বাছাইকরণ ঘটে তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোনো চেতনা নেই, পূর্ব পরিকল্পনা নেই, নেই দূরদৃষ্টি। এটি কোনো জীবকে পরিবেশের সাপেক্ষে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। জীবের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহের (traits) উপর যদিও প্রাকৃতিক নির্বাচন সক্রিয় কিন্তু জীবের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিবর্তিত হতে পারে। উদ্ভূত হতে পারে। মিউটেশনের মাধ্যমে ভ্যারিয়েশন ঘটে থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতিটি ইন্ডিভিজুআল বা একক জীবের উপর ক্রিয়াশীল থাকলেও ফলাফল প্রকাশ পায় সম্মিলিতভাবে গোটা প্রজাতিতে বা পপুলেশনে। তাই বলা যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যক্তিগত কোনো প্রক্রিয়া নয়। এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন মোটেও র‍্যান্ডম বা আকস্মিক, বিক্ষিপ্ত কিংবা দৈবক্রমে ঘটা কোনো ঘটনা নয়। এটি চূড়ান্ত (deterministic) প্রক্রিয়া। পরিবেশের জন্য উপযুক্ত ভ্যারিয়শনসম্পন্ন জীব অধিক হারে বংশধর রেখে যেতে পারে, আর অনুপযুক্ত ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন জীবের পরিবর্তিত পরিবেশে টিকে থাকা দায় হয়ে যায়, বিলুপ্তি ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। জীবজগতে 'নির্বাচন' ক্রিয়াশীল নন-র‍্যান্ডম, দৃঢ় ক্রমবর্ধমান (cumulative) পদ্ধতিতে। রোমান সভ্যতা যেমন একদিনে তৈরি হয় নি, উত্তর-দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বরফ যেমন তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত হয় নি,তেমনি প্রাকৃতিক নির্বাচন-ও তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনার ফল নয়, নয় ইতঃস্তত, বিক্ষিপ্ত চান্সের কোনো খেলা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কোনো 'কারণ' নয়, এটি জীবজগতে কয়েকটি ঘটনার সম্মিলিত ফলাফল বা পরিণতি। সংক্ষেপে কোনো প্রজাতিতে বা পপুলেশনে বংশানুসৃত প্রকরণের (variation) প্রভেদমূলক প্রজনন (differential reproduction) থাকে তবে ঐ প্রজাতিতে বা পপুলেশনে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিবর্তন ফলাফল হিসেবে প্রকাশিত হবে।(৫)

ডারউইন অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’কে মানুষের বোধগম্য করার জন্য কৃত্রিম নির্বাচন বিষয়টি প্রচুর উদাহরণের সাথে উপস্থাপন করেছেন। কৃত্রিম নির্বাচন (artifical selection) হচ্ছে আমরা মানুষেরা সচেতন বা অসেচতনভাবে জীবজগতে যে নির্বাচন পরিচালনা করি, তাকে বোঝায়। পৃথিবীতে কৃষির ইতিহাস মোটামুটি বেশ প্রাচীন। আধুনিক মানুষের উদ্ভব প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে ধারণা করা হয়।(৬) ফসল রোপন, কৃষির প্রচলন শুরু হলেও কৃষি, চাষাবাদ, খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য মজুদ রাখা ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের তখন কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না যথেচ্ছারভাবে চাষাবাদ এবং খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল মানুষ। পরবর্তীতে, আজ থেকে মাত্র ১৫ হাজার বছর আগে শষ্য, বীজ বোনার কৌশল, সেচ, সারের ব্যবহার, ফসলের প্রতি ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দূর করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি মানুষ ধীরে ধীরে রপ্ত করে কৃষিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন মিশর, ফিলিস্তিন, মেসোপটেমিয়ায় আজ থেকে ১১ হাজার বছর আগে খাদ্যশষ্যকে মানুষ প্রথম নিজেদের গার্হস্থ্যের আয়ত্তে আনে। খাদ্য চাহিদা পূরণ করে আপদকালীন সময়ের জন্য অধিক খাদ্য মজুদ রাখার প্রয়োজন থেকে অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনের জন্য শুরু থেকে কৃত্রিম নির্বাচন চালিয়ে আসছে। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা কৃষিকাজের গোড়ার দিকে হোমো সেপিয়েন্সরা অসচেতনভাবেই কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করেছিল। সবাই জানেন ‘কৃষকরা ক্ষেতে বীজ বোনেন ঘন করে। যাতে চারাগুলো নিজেদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা করে বড় হবে, কিন্তু একদম উঁচু লকলকে হতে পারবে না। এটা উদ্ভিদের আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামের উদাহরণ। কৃষকেরা ফসলের ক্ষেত থেকে আগাছা তুলে ফেলেন সুরক্ষার জন্য, গৃহপালিত পশুর শরীর থেকে উকুন জাতীয় পরজীবী বেছে ফেলে দিয়ে তাদের সুস্থ রাখেন। প্রকৃতিতে বেঁচে থাকতে তাদের সহায়তা করা হয়। নইলে আগাছাগুলো আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামরত চারাগাছগুলিকে দূর করে ক্ষেতকে খুব দ্রুত জঙ্গল বানিয়ে ফেলতো। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে গৃহপালিত গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীকে রক্ষার জন্য শক্ত বেড়া দিয়ে গোয়াল ঘর নির্মাণ

করে দেন। উকুন জাতীয় পরজীবীরা গৃহপালিত পশুর রক্ত খেয়ে রক্তশূন্য করে ফেলতো, বিভিন্ন ধরনের মহামারী রোগ ছড়িয়ে নির্বংশ করে ফেলতো। শিকারী প্রাণীরাও গৃহপালিত প্রাণীদের হত্যা করে ফেলতো।(৭) কৃষিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলি (traits) সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে কৃষকেরা কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতো মোটামুটি সেগুলি ছিল: দ্রুত বর্ধনশীল এবং বেশি ফলনে প্রজননক্ষম বীজ-শষ্য, বিভিন্ন বিরূপ ঋতুতে আবাদে সক্ষম, পোকামাকড় থেকে মুক্ত, সুস্থ সবল সতেজ বীজ-শষ্য, বাহ্যিক দিক থেকে আকষর্ণীয় ইত্যাদি। কৃষিতে এসব ভ্যারিয়েশন বাছাই করে মানুষ খাদ্যশষ্যের প্রচুর জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে গত কয়েক হাজার বছর ধরে শুধু কৃষিকাজে নয়, হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির কৃত্রিম প্রজননকারী বা খামারিরা বহু আগে থেকে কৃত্রিম নির্বাচন পরিচালনা করে আসছে। কৃত্রিম প্রজননকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত যে বৈশিষ্ট্যগুলি তা প্রাণীর নমনীয় খাদ্যাভ্যাস, দ্রুত বর্ধনশীল, রঙ ও আয়তনে তুলনামূলক আকর্ষণীয়, মানুষের চাহিদা-প্রয়োজন অধিক পরিমাণে পূরণ করতে সক্ষম ইত্যাদি। যেমন কোনো গরুর পপুলেশনে অধিক দুধ দিতে সক্ষম গরুগুলিকে বংশবৃদ্ধি করতে দেয়া হল। কম দুধের গরুগুলিকে তেমন বংশবৃদ্ধি করতে দেয়া হল না প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এভাবে কৃত্রিম নির্বাচন চলতে থাকলে একসময় এই গরুর পপুলেশনে শুধু অধিক দুধ দানে সক্ষম গরুগুলি টিকে থাকবে, বাকিগুলির ক্রমে বিলুপ্তি ঘটবে। শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রজননকারীরা প্রাণীর কৃত্রিম প্রজনন ঘটান না। গরুর অধিক দুধ দেওয়া ছাড়াও চাষাবাদে, হালের লাঙল টানার জন্য, মানুষের মাংসের খাদ্যাভ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য হৃষ্টপুষ্ট গরু বাছাইকরণ চলে। ইদানীং গরু মোটা তাজা করার জন্য বিভিন্ন কৃত্রিম পদ্ধতি ও ঔষধ ব্যবহার করা হয়। ফার্মের অধিক ডিমওয়ালা মুরগি, মোটাসোটা মুরগি মানুষের খাদ্যের জন্য কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি করা হয় বংশপরম্পরায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এভাবে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রজন্মান্তরে বাছাইকরণ ঘটে। বর্তমানকালে আমরা যে এতো নতুন নতুন জাতের

খাদ্যশষ্য, শাকসব্জি, ফলমূল, গৃহপালিত প্রাণী দেখি, তার বেশিরভাগ আমাদের কৃষক, খামারিরা নিজেদের পছন্দমত ভ্যারিয়েশন বাছাই করেছেন। প্রজন্ম পর প্রজন্ম ধরে এভাবে ভ্যারিয়েশন বাছাই চলতে চলতে নতুন নতুন উপপ্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নতুন উপপ্রজাতি থেকে একসময় সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতিরও উদ্ভব ঘটেছে। সবসময় ভ্যারিয়েশন বাছাই করে যে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো হয়েছে এমন নয়, কিছু ক্ষেত্রে সংকরজাত-ও তৈরি করা হয়েছে। ডারউইন কৃত্রিম নির্বাচনের উদাহরণ হিসেবে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে যেমন কুকুর, হাঁস, মুরগি, খরগোশ, কবুতরের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছিলেন। ডারউইনের মতে, Columbia livia বুনো রক জাতীয় কবুতর থেকে বিভিন্ন জাতের কবুতরের উদ্ভব ঘটেছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমানে ৩০৯ প্রজাতির কবুতর রয়েছে। এবং এই বিভিন্ন প্রজাতির কবুতর উদ্ভবের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে মানুষের কৃত্রিম নির্বাচন। সবচেয়ে প্রাচীন গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে কুকরকে গৃহপালনের মাধ্যমে মানুষ অনেকগুলো জাত যেমন গ্রেহাউন্ড, ব্লাডহাউন্ড, টেরিয়ার, স্পেনিয়েল, বুলডগ তৈরি করেছে ডারউইন বলেছেন, একই বুনো উৎস থেকে এদের বিভিন্ন জাতের উৎপত্তি। অনুমান করা হয়। এই কুকুরগুলোর পূর্বপুরুষ আজ থেকে বার হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার বছর আগেকার (মধ্যপ্রস্তর যুগ) এক ধরনের ছোট মুখওয়ালা পূর্ব এশিয়ান নেকড়ে।

উল্লেখ্য ২০০২ সালের নভেম্বরের ২২ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা ঝপরবহপব-এর নিবন্ধে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গৃহপালিত কুকুরের সকল বড় পপুলেশন থেকে ৬৫৪টি নমুনা সংগ্রহ করে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (mtDNA) সিকুয়েন্স পরীক্ষায় এদের পূর্বপুরুষ ১৫ হাজার আগেকার পূর্ব এশিয়ান নেকড়ে সম্পর্কে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে।(৮) কুকুরের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ সিকুয়েন্সের এ গবেষণা ডারউইনের বক্তব্যেরই সত্যতা নিশ্চিত করলো। ৯ হাজার থেকে ১১ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় বন্য প্রাণী mouflon -কে পোষ মানিয়ে ভেড়া উৎপাদন করা হয়েছে। খুব সম্ভবত চার হাজার পাঁচশ বছর আগে মধ্য

এশিয়ায় ঘোড়া প্রথম মানুষের গৃহপালিত পশু স্থান পায়। প্রাণীবিজ্ঞানীদের মধ্যে যদিও মুরগির উদ্ভব নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে, তবে বেশিরভাগ প্রাণীবিজ্ঞানী মনে করেন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও সাক্ষ্য দেয় চীন এবং ভারতে লাল বন্য মুরগি (Gallus gallus) যা আমাদের দেশের দেশি মুরগির মত দেখতে-বর্তমানকালের সব প্রজাতির মুরগির পূর্বপুরুষ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে পশ্চিম ইরানের জ্যাগরোস (zagros) পর্বতে ছাগল প্রথম গৃহপালনের মধ্যে আসে। ধারণা করা হয়, মধ্যপ্রাচ্য এবং চীনদেশে একই সময়ে শূকর মানুষের পোষ মেনেছিল। আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং খুব সম্ভবত পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবেই এক ধরনের হৃষ্টপুষ্ট মোষের মত দেখতে বন্যপ্রাণী aurochs -কে গৃহপালনের মাধ্যমে গবাদিপশুর বিভিন্ন জাত তৈরি করা হয়েছে। বন্য এ প্রাণীটি গত সতের শতকের (১৬২৭ সালের) দিকে ইউরোপ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ২০০৭ সালের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, বন্য বিড়াল মানুষের পোষ মেনেছিল আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আগে পারস্য উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে বিশ্বের প্রথমদিককার কৃষিভিত্তিক গ্রামে। এবং বর্তমানকালের বেশিরভাগ গৃহপালিত বিড়ালের পূর্বপুরুষ হচ্ছে ঐ অঞ্চলের পাঁচটি মাতৃতান্ত্রিক পূর্বপুরুষ (matrilineal ancestor)।(৯) ধারণা করা হয়, বন্যবিড়ালগুলো সেসময়ে মানুষের আশ্রয়ে এসেছিল পোষ মেনেছিল কারণ 'আপদকালীন সময়ের জন্য কৃষিশষ্য, খাদ্য মজুদ করার ফলে মানুষের আবাসস্থলের আশেপাশে ইঁদুর, ছুঁচো, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণী আশ্রয় নেয়। এদের খাদ্য হচ্ছে মানুষের খাদ্যশষ্য ধান-গম-ভুট্টোর বীজ, ফলমূল, আমিষ জাতীয় খাবার মাছ-মাংস, (মানুষের) ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার ইত্যাদি। বন্যবিড়াল যেমন এসব প্রাণীকে শিকার করে আবার মানুষের আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ আছে। ফলে মানুষের আবাসস্থলের আশেপাশে বন্যবিড়াল তার নিজের খাদ্যের সংস্থান, নিরাপদ আবাসস্থল, তুলনামূলক কম প্রতিযোগিতাময় পরিবেশ পায়। বনের বিশাল পরিবেশে খাদ্যের যোগান তুলনামূলক কষ্টসাধ্য। এবং বনে বন্যবিড়ালের অনেক বড় পপুলেশনের তুলনায় মানুষের

বাসস্থানের আশেপাশে বন্যবিড়ালের ছোট পপুলেশনে সীমিত আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়।' হয়তো এ ব্যাখ্যাটি মানুষের দ্বারা গৃহপালিত বেশিরভাগ পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ডারউইন কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে গৃহপালিত প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ছাড়াও উদ্ভিদ-ফুল-ফল, সজ্জি ইত্যাদি নিত্যদিনের ব্যবহার্যের চাক্ষুস প্রমাণ তুলে ধরেন। একটা পর একটা জীবের কৃত্রিম নির্বাচনের বর্ণনা প্রদান করে ডারউইন শেষে খুব যৌক্তিক প্রশ্ন করেন: 'মানুষ সুশৃঙ্খল ও অসচেতন নির্বাচন দিয়ে বড় রকমের সাফল্য লাভ করেছে। তাহলে প্রকৃতি কি এরকম কিছু করতে পারে না?মানুষ কেবল বাইরের এবং দৃশ্যমান চারিত্র্য (বৈশিষ্ট্য) নিয়ে কাজ করে। প্রকৃতি বাহ্যিক চেহারা নিয়ে মোটেও আগ্রহী নয়। প্রকৃতির কাছে একমাত্র বিষয় হচ্ছে চারিত্র্যটি জীবের কোনো প্রয়োজনে আসে কি-না। ...নির্বাচন প্রক্রিয়া মন্থর হলেও দুর্বল মানুষ যদি তার কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এত কিছু করতে পারে তাহলে প্রকৃতি যার সময়ের পরিসীমা নেই, বহুকালব্যাপী সব জীবের মধ্যে সহ-অভিযোজনের সৌন্দর্য, জটিলতা, জীবনের ভৌত পরিবেশের সাথে অভিযোজন সবই প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়েই প্রভাবিত হয়েছে।'(১০)

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তনের বিরোধিতা করে অনেক সময় অভিযোগ করা হয় 'কৃত্রিম নির্বাচনের পিছনে বেশিরভাগ সময় মানুষের সচেতন পরিকল্পনা-উদ্দেশ্য কাজ করে। আর জীববিবর্তন তত্ত্বে বলা হয় প্রকৃতিতে কোনো পরিকল্পনা-উদ্দেশ্য কাজ করে না। তাহলে এই দুটি বিষয় তো স্ব-বিরোধী। এভাবে একটা পদ্ধতি দিয়ে অন্যটি ব্যাখ্যা করা যায় না।'

সহজ উত্তর হচ্ছে মোটেও স্ববিরোধী নয়। এভাবে দুটি পদ্ধতিকে 'স্ববিরোধী' ভাবা বা দেখা ঠিক নয়। বিষয়টি একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হল: আমাদের চারপাশে প্রাকৃতিক পানি পাওয়া যায়। মাটির নীচে, খালে, বিলে, হ্রদে, নদীতে, সমুদ্রে। প্রকৃতিতে পানি কিভাবে তৈরি হয়েছে তা আমরা কেউ চাক্ষুস দেখিনি। খালি চোখে পানির রাসায়নিক গঠন দেখতে পারি না। গ্যাসীয় অণু খালি চোখে দেখা যায়

না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমরা জানি পানির অণুর রাসায়নিক গঠন হচ্ছে দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সাথে এক পরমাণু অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণ। এখন ল্যাবরেটরিতে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন গ্যাস মিশ্রণে কৃত্রিম পদ্ধতিতে পানি তৈরি করা মোটেও জটিল কাজ নয়। তাহলে কী বলা যায়, মানুষের তৈরি কৃত্রিম পদ্ধতি দিয়ে প্রাকৃতিক পানির রাসায়নিক গঠনের সঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না? প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বা বাস্তবতাকে মানুষ তার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচক্ষণতার দ্বারা কৃত্রিমভাবে সীমিত পরিসরে ঘটিয়ে ব্যাখ্যা করছে। শুধু জীববিজ্ঞানে নয়, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান,জ্যোর্তিবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সবকটি শাখাতেই প্রচুর উদাহরণ রয়েছে কৃত্রিমভাবে সীমিত পরিসরে গবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি ২০০৮ সালে শুরু হওয়া সার্ন (European Organization for Nuclear Research)-এর নেতৃত্বে বিশ্বের বৃহত্তম বিজ্ঞান প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম 'লার্জ হেড্রন কোলাইডার' প্রকল্পের কথা সবাই মোটামুটি জানি। বিশ্বের ১০০টি দেশের দশ হাজার পদার্থবিজ্ঞানী-প্রকৌশলী এ গবেষণা কাজে জড়িত আছেন। স্পেন, ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত এলাকার দশ মিটার ভূগর্ভে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ গোলাকার টানেলে পদার্থবিজ্ঞানের এ সময়কার সবচেয়ে জটিল গবেষণা কাজটি পরিচালিত হচ্ছে। সুদূর অতীতে গিয়ে মানুষের পক্ষে চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় বিগব্যাঙের সময় প্রকৃতি কি অবস্থায় ছিল বা মহাবিশ্বের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল। এলএইচসি প্রকল্পে পদার্থবিজ্ঞানীরা বীমের মধ্যে তীব্র গতিতে বিপরীতমুখী একগুচ্ছ প্রোটন কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে সীমিত পরিসরে বিগব্যাঙের সময়কালের একটি কৃত্রিম অবস্থা তৈরি করতে চাচ্ছেন। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এর মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানের একদম মৌলিক কিছু বিষয় যেমন প্রকৃতির আইন (laws of Nature) সম্পর্কে ইম্পিরিকাল তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যেকার বিষয়গুলো যাচাই করা যাবে এবং মহাবিশ্বের উদ্ভব বা বিগব্যাঙের সময়কার একদম প্রাক-প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অনেক

বেশি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।(১১)

এছাড়া পৃথিবীতে প্রাণ উদ্ভবের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ১৯২০ সালে রাশিয়ার প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার অপারিন এবং ইংরেজ জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন স্বতন্ত্র গবেষণার কথা এখানে স্মরণ করতে পারি। ১৯৫৩ সালে হ্যারল্ড ইউরি-স্ট্যানলি মিলারের গবেষণার কথাও প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পরিবেশে তৈরি এসব গবেষণা কাজ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বা বাস্তবতাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝার জন্য, জানার জন্য প্রয়োগ করেছেন। এখানে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পদ্ধতিকে আলাদা করে দেখা বা 'স্ববিরোধী' ভাবনা অবান্তর। প্রকৃতির বাস্তবতাকে মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা সেটি আসল কথা।

আমাদের চারপাশে যেমন কৃত্রিম নির্বাচনের উদাহরণের অভাব নেই তেমনি প্রাকৃতিক নির্বাচনেরও প্রচুর চাক্ষুস প্রমাণ রয়েছে। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন হয় না-এমন কথা স্পষ্টই ভ্রান্ত, মিথ্যে। এটা সত্য যে কৃত্রিম নির্বাচন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে পদ্ধতিগত অনেক মিল থাকলেও কিছু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। মানুষ বহুকাল আগে থেকে অসচেতনভাবে জীবজগতে কৃত্রিম নির্বাচন পরিচালনা করে আসছে। সচেতনভাবেও কৃত্রিম নির্বাচন পরিচালনা বেশ আগের ঘটনা। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে যখন কোনো জীবের পপুলেশনে বা প্রজাতিতে কোনো নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েশন অন্য ভ্যারিয়েশনের তুলনায় অধিক বংশধর রেখে যেতে পারে বংশপরম্পারায়। কিছু ভ্যারিয়েশন এমনিতে পরিবেশের পার্থক্যের কারণে কোনো একক জীবে হতে পারে (যেমন রোদে পুড়ে দেহের রঙ নষ্ট হতে পারে) কিংবা দেহকোষে কোনো মিউটেশনের কারণে হতে পারে কিন্তু তা পরবর্তী বংশধরে সঞ্চারিত হয় না। জননকোষে জিনেটিক পরিবর্তনের কারণে যেসব ভ্যারিয়েশন কোনো প্রজাতিতে বা পপুলেশনে দেখা যায় তাই পরবর্তী বংশধরে সঞ্চারিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের অংশ হতে হলে ভ্যারিয়েশনকে অবশ্যই

জননকোষের জিনেটিক পরিবর্তন হতে হবে। উক্ত ভ্যারিয়েশনটি যদি পরিবেশ থেকে কোনো অতিরিক্ত সুবিধা পায় তবে সেই ভ্যারিয়েশনের জীবটি অধিক বংশধর রেখে যেতে পারবে প্রকৃতিতে, অন্য ভ্যারিয়েশনগুলির তুলনায়। এ ধারা অব্যাহত থাকলে পরিবেশের সাপেক্ষে উপযুক্ত ভ্যারিয়েশন ছড়িয়ে পড়বে গোটা পপুলেশনে এবং এতে পপুলেশনের পূর্বের জিনপুলের (জিনভাণ্ডার) বদল ঘটবে। এভাবে পপুলেশনের বিবর্তন ঘটবে। কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়াটিও মোটামুটি এরকম। কোনো প্রজাতিতে বা পপুলেশনে বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন জীব বসবাস করে। এই বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন জীব থেকে মানুষ তার নিজের পছন্দমত এবং প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক ভ্যারিয়েশন বাছাই করে নেয়। যেমন ঘোড়ার পপুলেশন থেকে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য শক্ত সমর্থ সবল ঘোড়াকে বাছাই করা হয়। দুধের চাহিদা পূরণের জন্য গরুর ফার্মে অধিক দুধেল গরুগুলি বাছাই করা হয়। গরুর মাংস বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের ইচ্ছা থাকলে বড়সড় অধিক মাংসের অধিকারী গরুগুলি বাছাই করা হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল গাছ হলে সাধারণত বড় আকৃতির পাপড়িবিশিষ্ট, অধিক বর্ণিল, সুগন্ধযুক্ত বৈশিষ্ট্যের ফুল গাছ বাছাই করা হয়। এদের পরাগায়ণ বেশি ঘটানো হয় যাতে অধিক বংশধর রেখে যেতে পারে। এভাবে মানুষ তার পছন্দমত চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে জীবজগতে কৃত্রিম নির্বাচন চালায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা মানুষের নির্বাচিত ভ্যারিয়েশনটি একসময় গোটা পপুলেশনে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পপুলেশনের পূর্বের জিনগত কাঠামো বা সাধারণ জিনভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটে। পপুলেশনের বিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে কৃত্রিম নির্বাচনের কয়েকটি পার্থক্য হচ্ছে: (ক) কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রজাতি বা পপুলেশন থেকে পছন্দসই ভ্যারিয়েশন বা বৈশিষ্ট্য বাছাইয়ের পিছনে মানুষের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য বা পূর্বপরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় না। আর প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কোনো কারণ নয়। জীবজগতের কয়েকটি ঘটনার সম্মিলিত ফলাফল। (খ) মানুষের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে যার দ্বারা কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। প্রকৃতিতে

এমনটি নেই। (গ) প্রাকৃতিক নির্বাচনের তুলনায় কৃত্রিম নির্বাচন তুলনামূলক অনেক বেশি দ্রুত গতির। (ঘ) কৃত্রিম নির্বাচনের গোটা প্রক্রিয়াটি মানুষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। মানুষ চাইলে তার পছন্দের ভ্যারিয়েশনের বাইরে অন্য যে কোনো ভ্যারিয়েশনকে প্রজননে-বংশবিস্তারে বাঁধা দিতে পারে, বংশধর নির্মূল করতে পারে সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু প্রকৃতি সরাসরি প্রজননসক্ষম জীবের প্রজনন কাজে বা বংশবিস্তারে বাঁধা দেয় না। উপযুক্ত ভ্যারিয়েশনের বাইরে অন্য ভ্যারিয়েশনগুলির বংশধর এত সহজে নির্মূলও হয় না। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে ধীর গতির হয়ে থাকে। (ঙ) কৃত্রিম নির্বাচন দ্বারা গবেষণাগারে এবং গবেষণাগারের বাইরে জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া চাক্ষুস প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াও চাক্ষুস প্রমাণ করা গেছে। (চ) প্রাকৃতিক নির্বাচনে 'পরিবেশ' প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বিবর্তনের ক্ষেত্রে শিকারী কীটপতঙ্গ, পরাগায়ণের ক্ষমতা, মাটির উর্বরাশক্তি, আবহাওয়ার অবস্থা, খাদ্যের যোগান, সূর্যের তাপ ইত্যাদির ভূমিকা অপরিসীম। উদ্ভিদের প্রত্যেক ভ্যারিয়েশনকে এসব অবস্থা মোকাবেলা করে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে হয়। বংশধর রেখে যেতে হয়। যে ভ্যারিয়েশনটি পরিবেশের সাপেক্ষে যত বেশি উপযুক্ত সেই ভ্যারিয়েশনের বংশধর টিকে থাকে। ভ্যারিয়েশনটি ছড়িয়ে পড়ে বংশপরম্পরায়। কিন্তু কৃত্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষ নির্ধারণ করে কোন ভ্যারিয়েশন তার দরকার। কোন ভ্যারিয়েশন তার চাহিদা পূরণ করতে পারবে, সেই ভ্যারিয়েশনের বংশধর মানুষ টিকিয়ে রাখে।

জীববিবর্তনের বিরোধিতাকারীরা ব্যঙ্গ করে একসময় বলতেন "একটি ব্যাঙ যদি হুট করে রাজপুত্রে পরিণত হয়ে যায় তখন সে কাহিনীকে আমরা বলি রূপকথা, কিন্তু তার সাথে যদি আমরা কোটি কোটি বছর যোগ করি তখন এটা হয়ে যায় বিবর্তনবাদী বিজ্ঞান।"

জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় বিরোধিতাকারীদের ফ্যালাসি

(হেত্বাভাস) থেকে এই ধরনের ব্যঙ্গের সূত্রপাত। বিজ্ঞান (বা যুক্তি) আর ফ্যালাসির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বিজ্ঞান/যুক্তিতে বিশ্লেষণ থাকে, উপাত্ত থাকে, নির্মোহ হয়ে তথ্য নিংড়ে দেখার মানসিকতা থাকে, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ফ্যালাসিতে এসব কিছু থাকে না। থাকে শুধু গোঁজামিল। তিলকে তাল বানিয়ে দেখার প্রবণতা কাজ করে। ফ্যালাসির খুব সাধারণ একটি উদাহরণ দেই: প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের গালে দাঁড়ি হয়। রহিম একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। তার গালে দাঁড়ি আছে। আবার ছাগলের থুতুনিতে দাঁড়ি থাকে। অতএব রহিম একজন 'ছাগল' জাতীয় পুরুষ। এটা মোটেও যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা নয়। স্পষ্টই ফ্যালাসি।

আমরা এখানে ফ্যালাসির প্রসঙ্গটি বাদ রেখে অন্য প্রসঙ্গে যাই। জীববিজ্ঞানে বা জৈববিবর্তনে যাদের আগ্রহ আছে তাদের অনেকেই মনে করেন, (প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায়) জীবের বিবর্তন খুব জটিল এক প্রক্রিয়া এবং এর জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। হাজার হাজার প্রজন্মে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর লাগতে পারে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে কিংবা কোনো জীবের পপুলেশনের জিনপুলের পরিবর্তন হতে। চার্লস ডারউইন নিজেও অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে 'অত্যন্ত ধীর গতির পরিবর্তন' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিফেন আর. পালুম্বি (Stephen R. Palumbi) মনে করেন 'অত্যন্ত ধীর গতির' প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন-ধারণায় ডারউইন তার সুহৃদ চার্লস লায়েলের (১৭৯৭-১৮৭৫) ভূতাত্ত্বিক তত্ত্ব দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিগল জাহাজে ভ্রমণের (১৮৩১-১৮৩৬) সময় ডারউইন চার্লস লায়েলের তিন খণ্ডের বই Principles of Geology পাঠ করেন। চার্লস লায়েল তার গ্রন্থে ইংল্যান্ডের ভূস্থরের গঠন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঐ সময়ে প্রচলিত ধারণা ছিল আমাদের পৃথিবী খুব বেশি দিনের পুরানো নয়। ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্ব সালের ২৩ অক্টোবর ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি

করেছেন। সে হিসেবে পৃথিবীর বয়স মোটে ছয় হাজার বছরের কাছাকাছি। চার্লস লায়েল তার গ্রন্থে ‘অল্প বয়সী’ পৃথিবীর এ ধারণাটি অস্বীকার করেন। তিনি ইংল্যান্ডের চারপাশে স্তরে স্তরে সজ্জিত ভূস্থরের গঠন ব্যাখ্যা করেন। অত্যন্ত ধীর গতিতে পাথরের এ স্তরসমূহ ঘটিত হয়েছে, তাই পৃথিবীর ভূস্থরের গঠনের জন্য মাত্র ছয় হাজার বছর যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে শত মিলিয়ন বছর প্রয়োজন। ডারউইনও ইংল্যান্ডের দক্ষিণের ওয়েল্ড উপত্যকার ভূমি ক্ষয়ের হার হিসেব করে পৃথিবীর বয়স কমপক্ষে ৩০০ মিলিয়ন বছর বের করলেন। ডারউইন শুধু পৃথিবীর ভূস্থর গঠন দীর্ঘ সময়ে গঠিত হয়েছে তা মনে করতেন না, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো জীবের পপুলেশনের পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য অতি দীর্ঘ সময় প্রয়োজন বলে মনে করতেন। অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থ রচনায় Principles of Geology এবং চার্লস লায়েলের চিন্তার প্রভাব ডারউইন নিজে এভাবে বর্ণনা করেছেন: “I always feel as if my books came half out of Lyell’s brain, for I have always thought that the great merit of the Priciples, was that it altered the whole tone of one’s mind & therefore that when seeing a thing never seen by Lyell, one yet saw it partially through his eyes.”(১২)

বর্তমানকালে অধ্যাপক স্টিফেন পালুম্বিসহ অনেক জীববিজ্ঞানী মনে করেন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তনের গতি ‘সবসময় অতি মন্থর এবং জটিল’-এ ধারণাটি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। সকল জীবের ক্ষেত্রে বিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতির অথবা সকল জীবের ক্ষেত্রে বিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত গতির এমনটি নয়। জীবজগতে যেমন ধীর গতির বিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক দ্রুত গতির জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়াও ক্রিয়াশীল। দ্রুত গতির বিবর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ বছর সময়ের প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ধরনের অণুজীব নিয়ে গবেষণায় জীববিজ্ঞানীরা এ ধরনের প্রচুর দ্রুত গতির জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

যেমন এইচআইভি (Human immunodeficiency Virus)।

২০০৮ সালের এক হিসেবে পৃথিবীতে প্রায় ৩৩.৪ মিলিয়ন মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত রয়েছে। ১৯৮১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন ব্যক্তি এইডস রোগে মারা গেছে।(১৩) বিশ্বে আর কোনো জীবাণুতে এতো বেশি সংখ্যক লোকের আক্রান্ত হওয়ার নজির নেই। জানা মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতেই সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। এইচআইভি'র জিন সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ভাইরাসের পারিবারিক বৃক্ষে এইচআইভি'র 'নিকট আত্মীয়' হল এসআইভি (Simian immunodeficiency Virus) এবং ফিলাইন (feline) ভাইরাস থেকে বেশ দূরত্বে অবস্থান করছে। আবার ভাইরাসের ফ্যামিলি ট্রি-তে এইচআইভি'র অবস্থান দুটি জায়গায়। একটি হচ্ছে এইচআইভি-১, যা মানুষের মধ্যে মহামারী 'এইডস' রোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মানবদেহে পাওয়া এইচআইভি-১-এর সাথে আফ্রিকার সবুজ বানর, শিম্পাঞ্জির দেহে পাওয়া এইচআইভি জীবাণুর খুব বেশি মিল রয়েছে। ভাইরাসের পারিবারিক বৃক্ষতে অবস্থিত অন্য এইচআইভি'টি হচ্ছে এইচআইভি-২। আফ্রিকার কোনো জীবে এই জীবাণু তেমন একটা পাওয়া যায় না। দেখা গেছে জীবদেহে সংক্রমিত হওয়ার ক্ষমতা এর অনেক কম। মিউটেশনের হারও অনেক কম। এইডস রোগের জন্য এইচআইভি-২ জীবাণু দায়ী নয়। দায়ী শুধু এইচআইভি-১ জীবাণু। মানুষের দেহে 'অসূদন' (nonlethal) পরজীবী হিসেবে এইচআইভি-২ 'শান্তশিষ্ট ভদ্র' হয়ে বসবাস করতে পারে। এসআইভি'র জিন সিকুয়েন্সের সাথে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে এইচআইভি-২-এর জিন সিকুয়েন্সের। বিজ্ঞানীরা বলেন পশ্চিম মধ্য-আফ্রিকার শিম্পাঞ্জি থেকে এইচআইভি-১ জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করেছিল। ঠিক কবে এ জীবাণুটি মানবদেহে প্রবেশ করেছে তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এ জীবাণুটি খুব বেশিদিন আগে মানবদেহে প্রবেশ করে নি বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৫৯ সালে কোনো এক কারণে আফ্রিকার দেশ কঙ্গো থেকে ১২১৩টি রক্তরসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু রক্তরসের নমুনা সংগ্রহ করার পর এ নিয়ে কোনো গবেষণা হয় নি। ১৯৯৭ সালে এই

নমুনাগুলো হঠাৎ করে উদ্ধার হওয়ায় গবেষণার জন্য আনা হল। দেখা গেল রক্তরসের নমুনাগুলো এইচআইভি পজেটিভ। জিন সিকুয়েন্স গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেল, ১৯৫৯ সালের এইচআইভি-১ জীবাণু বর্তমানকালে মানুষের শরীরে সংক্রমিত এইচআইভি-১-এর পূর্বপুরুষ। ইতিমধ্যে বিবর্তনের মাধ্যমে এইচআইভি-১-এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের পূর্বে কোনো এক সময় এটি হয়তো মানুষের দেহে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু বিজ্ঞানীরা নিশ্চিৎ বেশি দিন আগে নয়। খুব সম্ভবত ১৮৯০ সাল থেকে ১৯২০ সালের দিকে। তবে মানবদেহে প্রবেশের পর এ জীবাণু 'বিপ্লব' ঘটিয়ে দিয়েছে। গত তিন দশক ধরে বিজ্ঞানীরা এইচআইভি-১-এর কোনো কার্যকর প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করতে পারছেন না। কোনো ভ্যাক্সিন দিয়ে এইচআইভি-১ জীবাণুকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। কারণ এইচআইভি-১ জীবাণুর দ্রুত গতির বিবর্তন। মাত্র দুই মাসের ভিতর এইচআইভি-১ জীবাণুর বিবর্তন ঘটে পোষক দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) থেকে নিজেকে 'আড়াল' করে ফেলতে পারে। আমরা জানি 'ভাইরাস' সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এমন কী গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাহির থেকে খাদ্য প্রদান করলে এদের বংশবৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এইচআইভি-২ এইডস রোগের জন্য দায়ী নয়, তাই এখানে শুধু এইচআইভি-১ জীবাণুর বিবর্তন নিয়েই আলোচনা করা হবে। এখানে 'এইচআইভি' বলতে 'এইচআইভি-১' জীবাণুকেই বোঝানো হচ্ছে। পোষক প্রজাতিতে (host species) অবস্থিত এইচআইভি-এর কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে দেখা যায় : (ক) এইচআইভি'র মিউটেশনের হার খুব বেশি। (খ) নির্বাচিত ভাইরাসগুলো পোষক দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কৌশলে ফাঁকি দিতে পারে। পোষক দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে পারে। যাকে আমরা 'এইডস' রোগ বলে থাকি। (গ) নির্বাচিত ভাইরাসগুলো এন্টিভাইরাল ড্রাগ বা ভ্যাক্সিনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

এইচআইভি অধিক হারে বংশ বৃদ্ধি করে বলে এর মধ্যে মিউটেশনের হারও বেশি। ফলে ভ্যারিয়েশনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন সম্পর্কে পূর্বে জেনেছি, কোনো জীবের পপুলেশনে যথেষ্ট পরিমাণে ভ্যারিয়েশন থাকলে পরিবর্তিত পরিবেশের সাপেক্ষে উপযুক্ত ভ্যারিয়েশন জীবন সংগ্রামে টিকে যায়, বংশবিস্তার করে। ক্রমে ঐ ভ্যারিয়েশনই গোটা পপুলেশনের ছড়িয়ে পড়ে। পপুলেশনের সাধারণ জিনভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটে। আর সব জীবের মত এইচআইভি'র একটি জিনোম আছে। বেশির ভাগ জীবের (এমন কী খুব সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার) জিনোমে ডিএনএ রয়েছে কিন্তু এইচআইভি'র জিনোমে ডিএনএ নেই, রয়েছে আরএনএ। অবশ্য রেট্রোভাইরাসের জিনোমেও আরএনএ রয়েছে। এইচআইভি'র বংশবিস্তারের জন্য ডিএনএ আছে এমন উপযুক্ত পোষক জীবের প্রয়োজন। এইচআইভি এক্ষেত্রে (বংশ বিস্তারের জন্য) সাধারণত মানুষের দেহকোষকে ব্যবহার করে। এইচআইভি সংক্রামক কোনো জীবাণু নয়। অর্থাৎ বাতাসে উড়ে, হাঁচি-কাশি-স্পর্শের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় না। এইচআইভি'র জীবাণু আছে যে জীবদেহে (মানবদেহে) ঐ ব্যক্তির সাথে রক্তের বিনিময় হলে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন হলে। এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের গর্ভের সন্তান এইচআইভিতে আক্রান্ত হতে পারে। অথবা এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ পান করলে। মানুষের দেহকোষে এইচআইভি প্রবেশ করার পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে লক্ষ লক্ষ কপি রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে নিজেদের বংশ বিস্তার করে। এই কপিগুলো মানবদেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এরা দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এইচআইভি নিরাময়ে এখন পর্যন্ত ভ্যাক্সিনগুলো ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা জানি পোষক দেহে অবস্থিত এইচআইভি পপুলেশনের একটি সাধারণ জিনভাণ্ডার রয়েছে। এইচআইভি জীবাণুর পপুলেশনে সবাই সমান রোগ প্রতিরোধী নয়। ভ্যারিয়েশন অবশ্যই আছে। কেউ কেউ খুব কম মাত্রার ভ্যাক্সিন প্রয়োগে মারা যায়, কাউকে অনেক বেশি মাত্রার ভ্যাক্সিন প্রয়োগে মারতে হয়। ধরা যাক এইচআইভি আক্রান্ত

দেহে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হল এবং এতে বেশিরভাগ জীবাণুই মারা গেল। অর্থাৎ বেশির ভাগ জীবাণুই 'জীবন সংগ্রামে' টিকে থাকতে পারলো না। কিন্তু ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করার পরও পরিবর্তিত পরিবেশের সাপেক্ষে উপযুক্ত ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন খুব অল্পসংখ্যক ভাইরাস কোনো রকমে টিকে যেতে পারে। যাদেরকে ঐ পূর্বের নির্দিষ্ট মাত্রার ভ্যাক্সিন প্রতিরোধ করতে পারে না। এই টিকে যাওয়া ভাইরাস থেকে আবার নতুন লক্ষ লক্ষ কপি নতুন ভাইরাসের জন্ম হয়। তারা পূর্বের নির্দিষ্ট মাত্রার ভ্যাক্সিন-প্রতিরোধী ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়। এর পরের প্রজন্মের ভাইরাসেরও ভ্যাক্সিন-প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকে। এভাবে ভাইরাসের পপুলেশনে পূর্বের সাধারণ জিন ভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এইচআইভি জীবাণুর কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সাধারণ জিনভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটে যায়। এইচআইভি জীবাণুর দ্রুত বিবর্তনে পোষক দেহে ভ্যাক্সিনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে যায়। রোগীর শরীরের 'রোগ' নিরাময় করতে পারে না।(১৪)

অণুজীব (এইচআইভি) ছাড়াও দ্রুত গতির বিবর্তনের একদম সদ্য সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হচ্ছে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ফিঞ্চ পাখি। এদের কেউ কেউ আদর করে ডাকেন 'ডারউইনের ফিঞ্চ'। আমাদের দেশের চড়–ই বা মুনিয়া পাখির মত দেখতে ফিঞ্চ পাখিগুলো। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের সময় ডারউইন চারটি গণের ১৩টি প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি দেখতে পান এবং এদের নমুনা সংগ্রহ করেন।□ কিন্তু এগুলো যে 'একই পাখির ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি' কিংবা এরা সবাই যে ফিঞ্চ পাখি তা ডারউইন বুঝতে পারেন নি। পাখিগুলোর দেহের গঠন, রঙ (বাদামি এবং কালো রঙের হয়ে থাকে), পালকের বৈশিষ্ট্য, ঠোঁটের দৈর্ঘ্য-আকৃতি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি গভীরভাবে সম্পর্কিত।□ ডারউইন বিগল ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে আসার পর ১৮৩৭ সালে ইংল্যান্ডের পাখি-বিশেষজ্ঞ (Ornithologist) John Gould -এর সহায়তায় ফিঞ্চ পাখিগুলোর নমুনা পরীক্ষা করে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। যাহোক, যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিবর্তন বিজ্ঞানী বারবারা রোজম্যারি

গ্রান্ট এবং পিটার র‍্যামন্ড গ্রান্ট দম্পতি গত তিন দশক ধরে গ্যালাপাগোসের বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি নিয়ে গবেষণা করছেন। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ফিঞ্চ পাখিগুলোর খাদ্য হচ্ছে বিভিন্ন ফলের বীজ। খাদ্য হিসেবে এটি তেমন উপযুক্ত নয়। ফলের বীজ খেতে হলে পাখিদের নখর এবং ঠোঁটের ব্যবহার করতে হয় বেশি। তাই দেখা গেছে খাবারের প্রকৃতি অনুযায়ী ফিঞ্চ পাখিদের ঠোঁটের আকার ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো ফিঞ্চ পাখির ঠোঁট স্যুপের চামচের মত, কারো ঠোঁট চিমটির মত, কারো তীক্ষ্ণ ঠোঁট, কারোবা চ্যাপ্টা ঠোঁট, ইত্যাদি। অর্থাৎ ঠোঁটের আকার নির্ধারণ করছে কোন ধরনের বীজ ফিঞ্চ পাখি গ্রহণ করতে পারবে। ঠোঁটের দৈর্ঘ্য যার বড়, সেই পাখি বড় বীজ খেতে পারবে। ছোট দৈর্ঘ্যের ঠোঁট বড় বীজ খেতে পারে কিন্তু তা অনেকটা চপস্টিকের মত হয়ে যায়। স্বাচ্ছন্দের সাথে দ্রুত খাদ্য গ্রহণ এভাবে সম্ভব হয় না। ফিঞ্চ পাখিদের ঠোঁটের দৈর্ঘ্য যদিও মিলিমিটারে হিসাব করতে হয়, রোজম্যারি এবং পিটার গ্রান্টের নেতৃত্বে গবেষকদল পাখিদের ঠোঁটের দৈর্ঘ্যের হিসাব করছেন এবং আবিষ্কার করলেন ছোট দৈর্ঘ্যের ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ পাখিরা বড় আকারের বীজ খায় না, কিন্তু বড় দৈর্ঘ্যের ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ পাখিরা বড় আকারের বীজ খাচ্ছে। যখন গ্যালাপাগোস দ্বীপে প্রচুর ফসল হয়, বৃষ্টি হয়, তখন বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সাইজের ছোট, বড়, ভাঙা বীজ। ফিঞ্চ পাখিদের খাদ্যগ্রহণও তখন বেশ ভালো হয়। বীজের আকৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি তখন ফিঞ্চ পাখিদের কাছে গণ্য হয় না। কিন্তু গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে ফিঞ্চ পাখিদের যখন খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, বৃষ্টিপাত কম হয়। সূর্যের তীব্রতাপে দ্বীপের ভূমি অগ্নিতপ্ত হয়। বেশিরভাগ উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। উদ্ভিদে ফল হয় না। বীজের সংকট তৈরি হয়। তখনই জীবন সংগ্রামের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় ফিঞ্চ পাখিদের। যে বীজগুলোর ভাঙাচোরা গঠনের কারণে উদ্বৃত ফসলের সময় ফিঞ্চ পাখিরা এড়িয়ে যেত, সেই বীজগুলোই খরার সময় ক্ষুধার্ত ফিঞ্চ পাখিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সবে ধন নীলমণি হয়ে দেখা দেয়। ফিঞ্চ পাখিদের গড় আয়ু হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ বছর। রোজম্যারি এবং পিটার গ্রান্ট দম্পতি তাদের দীর্ঘ তিন দশকের

পর্যবেক্ষণে দেখেছেন বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চ পাখিদের ঠোঁটের ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন বিভিন্ন পপুলেশন রয়েছে। এসব পপুলেশনের ফিঞ্চ পাখিদের খুব সামান্য পরিমাণ ঠোঁটের আকৃতির পার্থক্যও জীবন-সংগ্রামের মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যের অভাবের সময় যেসব ফিঞ্চ পাখির ঠোঁটের দৈর্ঘ্য বড় তারা বেশিদিন বাঁচে তুলনামূলকভাবে যেসব ফিঞ্চ পাখির ঠোঁটের দৈর্ঘ্য ছোট তারা তাড়াতাড়ি মারা যায়। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে খরা খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই দুর্ভিক্ষও খুব বেশি দিন থাকে না। আবার বৃষ্টিপাত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদে ফল ধরে। ফিঞ্চ পাখিগুলোও তাদের খাদ্যের নিশ্চয়তা পায়। শুষ্ককালে বিভিন্ন প্রজাতির পপুলেশনে বড় ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ পাখির সংখ্যা খুব দ্রত বৃদ্ধি পায় এবং বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বড় ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ পাখিদের জিন বংশ পরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ে।(১৫)

স্টিকেলব্যাক (stickleback) মাছের দৈহিক গঠনের দ্রুত বিবর্তনও এখানে প্রাসঙ্গিক। উত্তর আমেরিকা, উত্তর ইউরোপ, উত্তর এশিয়ার মিঠা বা স্বাদুপানির হ্রদ, নদী, জলাশয়ে এবং সমুদ্রে স্টিকেলব্যাক মাছের কয়েক প্রজাতি (যেমন: Gasterosteus aculeatus, Gasterosteus microcephalus, Gasterosteus wheatlandi, Pungitius hellenicus, Pungitius kaibarae ইত্যাদি) পাওয়া যায়। স্টিকেলব্যাক মাছ আকারে বেশ ছোট। ৬ থেকে ১০ সেন্টিমিটারের মত লম্বা হয়ে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বুড়ো আঙুলের সমান প্রায়। আজ থেকে প্রায় ১৫ হাজার বছর পূর্বে সর্বশেষ বরফ যুগের সময়, তুষার স্রোতে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় স্টিকেলব্যাক মাছের সাধারণ পূর্বপুরুষের মূল পপুলেশন সমুদ্র লবনাক্ত পানি থেকে বিভিন্ন এলাকায় নদী, হ্রদ এবং অন্যান্য অগভীর জলাশয়ের মিঠা পানিতে বিভিন্ন পপুলেশনে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে স্টিকেলব্যাক মাছের আলাদা আলাদা প্রজাতি ভিন্ন ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে (লোনা পানি, মিঠা পানি, গভীর জলাশয়ের তলদেশে, অগভীর জলাশয় ইত্যাদি) অভিযোজিত হয়েছে।

নরওয়ের জীববিজ্ঞানীরা গত সাড়ে তিন দশক ধরে সমুদ্র, নদী, হ্রদ ইত্যাদি পৃথক পৃথক বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের (ecological niches) স্টিকেলব্যাক মাছের বংশবিস্তার, জীবনধারা, ক্রমবিকাশ নিয়ে গবেষণা কাজ পরিচালনা করছেন। সমুদ্রের Gasterosteus aculeatus প্রজাতির স্টিকেলব্যাক মাছের শরীরে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত শক্ত এবং বড় ৩৫টি হাঁড় বা কাঁটার স্তর দেখা গেলেও এর মধ্যে তিনটি কাঁটা বেশ বড়। এজন্য একে ডাকা হয় threespine stickleback fish নামে। কিন্তু হ্রদ, নদী কিংবা অন্য মিঠা পানির অগভীর জলাশয়ের স্টিকেলব্যাক মাছের শরীরে বড় তিনটি কাঁটাসহ এতগুলি কাঁটার স্তর দেখা যায় না। বেশিরভাগ মিঠা পানির জলাশয়ে স্টিকেলব্যাক মাছের পপুলেশনে ০ থেকে ৯টি কাঁটা বা হাঁড়ের প্লেট দেখা যায়। শরীরে হাঁড় বা কাঁটার সংখ্যা কমে যাওয়ায় মিঠা পানির স্টিকেলব্যাক মাছের দেহের নমনীয়তা পেয়েছে এবং সাতারেও বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন সমুদ্র বা অন্য মুক্ত জলাশয়ে স্টিকেলব্যাক মাছের বড় কাঁটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বড় এবং শক্ত হাঁড়গুলি স্টিকেলব্যাক মাছের দেহে থাকার ফলে শিকারী মাছ বা জীব থেকে এরা সহজে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। শিকারী মাছ বা জীব সহজে স্টিকেলব্যাক মাছকে কাবু করতে পারে না। সমুদ্রে বসবাসের জন্য এই দৈহিক গঠনটি (বড় ও শক্ত হাঁড়গুলি) স্টিকেলব্যাক মাছের জন্য প্রয়োজন। ফলে স্টিকেলব্যাক মাছের এই দৈহিক বৈশিষ্ট্য সামুদ্রিক প্রতিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় টিকে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে অগভীর জলাশয়, হ্রদ বা নদীতে বাসকরা স্টিকেলব্যাক মাছের বড় কাঁটার দৈহিক বৈশিষ্ট্য তার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ফড়িং (dragonfly) বা এই ধরনের জলের কাছাকাছি বাস করা কীটপতঙ্গ সহজে অগভীর মিঠাপানির স্টিকেলব্যাক মাছের পোনার লম্বা হাঁড়গুলি ধরে শিকার করে। অগভীর মিঠাপানির জলাশয়ে তাই লম্বা তিন কাঁটা বা হাঁড় স্টিকেলব্যাক মাছের শরীরে দেখা যায় না। সেখানে বেশ ছোট আকৃতির এবং একেবারে কম সংখ্যার কাঁটার দৈহিক বৈশিষ্ট্য স্টিকেলব্যাক মাছের মধ্যে বিকশিত হয়েছে।

আলাস্কার লোবার্গ হ্রদে মাত্র এক যুগের মধ্যে ছয়টি প্রজন্মে স্টিকেলব্যাকের কাঁটার বিবর্তন জীববিজ্ঞানীদের কাছে চমকপ্রদ উদাহরণ। ১৯৮২ সালের দিকে সমুদ্রে রাসায়নিক দূষণের ফলে স্টিকেলব্যাক মাছের বেশ বড় পপুলেশন আলাস্কার লোবার্গ হ্রদে এসে উপনিবেশ গড়ে তুলে। জীববিজ্ঞানীরা টানা বারো বছর (১৯৯০ থেকে ২০০১ সাল) নিয়মিত লোবার্গ হ্রদ থেকে স্টিকেলব্যাকের নমুনা সংগ্রহ করতেন তাদের বংশবিস্তার, জীবনধারা, ক্রমবিকাশ পরীক্ষণের জন্য(১৬)। সমুদ্রের লবনাক্ত জল থেকে আসা স্টিকেলব্যাক মাছেরা মাত্র এক দশকের মধ্যেই নতুন পরিবেশ মিঠা পানির হ্রদের সাথে অভিযোজিত হয়ে যায়। জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষণের জন্য সমুদ্র থেকে স্টিকেলব্যাক মাছ সংগ্রহ করে নদীতে ছেড়ে দেখলেন, মাত্র কয়েক প্রজন্মেই স্টিকেলব্যাকের নতুন পপুলেশনে বাড়তি হাঁড়ের স্তর বিলোপ হয়ে গেছে। বিভিন্ন পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন পপুলেশনের স্টিকেলব্যাক মাছের জিনোম বিশ্লেষণ করে দেখা গেল Pitx1 নামক একটি মাত্র জিন স্টিকেলব্যাক মাছের পেলভিক বা শ্রোণীর হাঁড় হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য দায়ী। Pitx1 জিন জীবের কঙ্কালতন্ত্রের আকৃতি প্রদানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিন। জীবের দৈহিক গঠনের জন্য দায়ী অন্য জিনগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে Pitx1 জিনটি কাজ করে। এ জিন চতুস্পদী উভচর জীব (ব্যাঙ, স্যালামান্ডার ইত্যাদি) এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর (যেমন ইঁদুর) সামনের পা বা বাহু থেকে একটু পৃথকভাবে পিছনের পা বা বাহু গঠনে সাহায্য করে। শ্রোণীর হাঁড়গুলি স্টিকেলব্যাক মাছের পশ্চাদ্বাহুর (hindlimbs) অংশ। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বংশগতিবিদ (Genetist) ডেভিড কিংসলে, ডল্ফ শ্লুটার (Dolph Schluter), জেনি গ্রিমউড, রিচার্ড মায়ার্স এবং তাদের সহযোগী গবেষকরা স্টিকেলব্যাক মাছের শ্রোণীর হাঁড় পরিবর্তন এবং কঙ্কালতন্ত্রের পরিবর্তনের বিষয়টি চাক্ষুস প্রমাণের জন্য একটি পরীক্ষা চালিয়েছেন। তারা সমুদ্রের Gasterosteus aculeatus প্রজাতির বড় তিন কাঁটাওয়ালা স্টিকেলব্যাক মাছের কোষ থেকে Pitx1 জিনটি আলাদা করে অগভীর জলাশয়ের স্টিকেলব্যাক মাছের ডিমে ইনজেকশন দিয়ে প্রবেশ করালেন। দেখা গেল, ডিম থেকে জন্ম নেওয়া মাছের

পোনার শরীরে বাড়তি হাঁড়ের স্তর তৈরি হয়েছে, যা এই মাছদের কয়েক প্রজন্ম আগের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না। ভিন্ন ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে একটি মাত্র জিনের পরিবর্তনে স্টিকেলব্যাক মাছের মধ্যে এত সরল উপায়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে শারীরস্থানিক পরিবর্তন ঘটেছে তাতে বিজ্ঞানীরা বেশ অবাকই হয়েছেন। তাই স্টিকেলব্যাক মাছ বর্তমানকালের জীববিজ্ঞানীদের কাছে দ্রুত গতির জীবের বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।(১৭)

জীববিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব (Modern Synthesis Theory of Evolution) দ্বারা 'সকল জীব এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে'-শুধু এ প্রস্তাবনাকে বুঝায় না। নতুন প্রজাতি উৎপত্তির পাশাপাশি এ তত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরে জীবজগতে ভ্যারিয়েশন বা বৈচিত্র্য উদ্ভবের কারণ এবং প্রক্রিয়া, নিজের অজান্তে জীবের জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া, প্রতিবেশের সাথে জীবের অভিযোজন (Adaptation), জীবের টিকে থাকা, জীবের বিলুপ্তি (Extinction), জীবের ভৌগলিক বিন্যাস, জীবের প্রতিবেশ, জীবের অভিপ্রয়াণ, জীবের পরিবেশগত ভারসাম্য ইত্যাদি বিষয়কে। অর্থাৎ জীববিবর্তন কি, কেন এবং কিভাবে প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল থাকে বিস্তৃত পরিসরে তার প্রমাণসহ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করাই এ তত্ত্বের আলোচ্য।

বিবর্তন-বিরোধীরা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীববিবর্তনকে অনেক সময় 'নিছক তত্ত্ব' হিসেবেই উপস্থাপন করেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন অবশ্যই জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব (পাশপাশি জীবের পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া)। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের এটমিক থিওরি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি, থিওরি অব রিলেটিভিটি, থিওরি অব গ্র্যাভিটি'র মত প্রমাণিত তত্ত্ব। এটি আর বর্তমানে কোনো অনুকল্প বা ব্যক্তিবিশেষের ধারণা নয়। নয় কতিপয় ব্যক্তির কষ্টকল্পনা 'ঈশ্বরদ্রোহী মতবাদ'। এটা সত্য, ডারউইন যুগে বিজ্ঞান বিশেষ করে জীববিজ্ঞান 'বংশগতি' সম্পর্কে অনেকাংশে পিছিয়ে ছিল। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' জীবের বিবর্তন

সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ছিল না। ডারউইনের প্রস্তাবনায় বংশগতি সঞ্চরণের প্রক্রিয়া, বংশধরদের মধ্যে ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল না। স্বাভাবিকভাবে ম্যান্ডেলের বংশগতি সঞ্চরণের সূত্রাবলী, জিনের মিউটেশন, ডিএনএ কোড সম্পর্কে ডারউইন অবহিত ছিলেন না। ডারউইন তার প্রস্তাবনার কিছু সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (Difficulties of the Theory) তুলে ধরেছিলেন এ রকম কিছু সীমাবদ্ধতা, যেমন অন্তর্বর্তী প্রাণীর স্বল্পতা, জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভব সম্পর্কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যা, সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যা, প্রজাতির মধ্যে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারণশীল বৈশিষ্ট্য কিভাবে সঞ্চারিত হয় ইত্যাদি। ডারউইন সীমাবদ্ধতাগুলো দূরীকরণে কিছু ব্যাখ্যাও প্রদান করেছিলেন কিন্তু সে সময় বংশগতির সঞ্চরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকায় অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের দিকে জীববিবর্তনের সংশ্লেষণী তত্ত্বের উন্মেষের সাথে সাথে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রস্তাবনার সাথে বংশগতি সঞ্চরণের সূত্র, জিনের মিউটেশন ইত্যাদি বিষয়াবলী সংযুক্ত হয়।(১৮) এর ফলে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রস্তাবনার সীমাবদ্ধতাগুলিও দূরীভূত হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্নজীববিদ্যা বা ফসিলবিদ্যা থেকে জানা যায়, বিলুপ্ত প্রজাতির জীবনধারা, প্রতিবেশ (Ecology), তাদের জীবনধারণের সময়কাল, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উদ্ভব প্রক্রিয়া ইত্যাদি। তুলনামূলক শারীরসংস্থানবিদ্যা (Comparative Anatomy) জানায় একই পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত জীবসমূহের অঙ্গসংস্থানের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য। জৈবভূগোল (Bio-Geopgraphy) হতে জানতে পারি জীবের ভৌগলিক বিন্যাস, তাদের অভিযোজন, জীবের পরিবেশগত ভারসাম্য, জীবের প্রতিবেশ। যেমন : মারসুপিয়াল প্রাণী কেবল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া যায়, আফ্রিকাতে নয়। এশিয়া মহাদেশের কিছু দেশের (ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি) বনাঞ্চলে বাঘের অস্তিত্ব রয়েছে, আবার এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম

অঞ্চলের বনগুলোতে বাঘের কোনো অস্তিত্ব নেই কিংবা ইউরোপ-আফ্রিকার বনাঞ্চলে বর্তমানে বাঘের অস্তিত্ব নেই। একসময় তুরস্কের বনে বাঘের বসবাস ছিল। বর্তমানে তুরস্ক থেকে বাঘের বিলুপ্তি ঘটেছে। এই যে পরিবেশ-প্রতিবেশ ভেদে জীবের (উদ্ভিদ-প্রাণী সকলেই) অবস্থান, বণ্টন, অভিযোজন, কিংবা জীবের বিলুপ্তি এসবই জৈবভূগোলের আলোচ্য। যা থেকে জীবের বিবর্তন ধারা সম্পর্কে আমরা প্রচুর তথ্য জানতে পারি। আণবিক জীববিজ্ঞান, বিবর্তনীয় বিকাশমূলক জীববিজ্ঞান (Evolutionary Developmental Biology) হতে জানি, ক্রোমোসোম মিউটেশন, জেনেটিক মিউটেশন কিভাবে ঘটে, জীবদেহে তার প্রভাব, প্রজাতিতে প্রকরণ বা Variation উদ্ভবের কারণ ও প্রক্রিয়া, আণবিক পর্যায়ে বিবর্তনের ধরন, একই সাধারণ পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত জীবসমূহের আণবিক পর্যায়ে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি। একটা সময় আণবিক গবেষণায় বিভিন্ন প্রাণীর প্রোটিন বিশ্লেষণ করা হত। কিন্তু এ পরীক্ষাটি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং শ্রমসাধ্য হওয়ায় বৈজ্ঞানিক মহলে পদ্ধতিটি তেমন প্রচলিত হয়নি। তাছাড়া জীবদেহের অল্প কিছু প্রোটিন থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেকার পূর্ণাঙ্গ তুলনা করা যায়। ডিএনএ সিকুয়েন্সের বিশ্লেষণে এ অসুবিধাগুলি নেই। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এ পরীক্ষণ কার্যক্রম বর্তমানে বেশ সহজলভ্য। ওষুধশিল্প, কৃষি গবেষণা, ফরেনসিক গবেষণায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জীবের ডিএনএ সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ চলছে। ডিএনএ সিকুয়েন্সের তুলনা থেকে জীবজগতে বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তনীয় ইতিহাস বা জীবন বৃক্ষে (Tree of life) তাদের অবস্থান জানা যায়। ডারউইনের প্রস্তাবিত ‘জীবন বৃক্ষ’ একটি জটিল রেখাচিত্র যার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রজাতির জীবনের ইতিহাস প্রকাশ করে। গাছের মত অঙ্কিত রেখাচিত্রের একেবারে নীচে রয়েছে সকল জীবের ‘সর্বশেষ সর্বজনীন সাধারণ পূর্বসূরি’ যাকে ইংরেজিতে বলে last universal common ancestor বা LUCA। অর্থাৎ পৃথিবীতে উদ্ভূত প্রথম জীব। এখান থেকে বিকশিত হয়ে গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ড বার বার বিভক্ত হয়ে তৈরি করেছে প্রচুর শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল এক বৃক্ষ। এক একটি শাখা প্রকাশ করে এক একটি প্রজাতি এবং শাখা বিভক্ত হওয়ার বিন্দু হচ্ছে

যেখানে এক প্রজাতি থেকে একাধিক প্রজাতি উদ্ভূত হয়েছে। এই রেখাচিত্রের বেশিরভাগ শাখা-প্রশাখা কানাগলিতে হারিয়েছে, ক্ষয় হয়েছে, ঝরে গেছে অর্থাৎ দূর অতীতে যেসব জীবের বর্গ, গোত্র, গণ, প্রজাতিগুলো পৃথিবী থেকে নানা সময়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা মারা গেছে। এদের এখন শুধু পাওয়া যায় ফসিল অবস্থায়। আবার কিছু শাখা একদম উপরের দিকে চূড়ার কাছাকাছি রয়েছে, যা নির্দেশ করে বর্তমানে জীবন্ত প্রজাতির। সহজ ভাষায় বলা যায়, জীবন বৃক্ষ হচ্ছে, 'পৃথিবীতে জীবের বিবর্তনের ইতিহাস। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ উদ্ভূত হওয়ার পর থেকে প্রজাতির বিবর্তন ধারা কোন পথে এগিয়েছে, কিভাবে প্রতিটি প্রজাতি অন্য প্রজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট।'(১৯) বৃহৎ পরিসরে ডিএনএ গবেষণা থেকে নিশ্চিৎ হওয়া গেছে, দুটি প্রজাতি যত কাছাকাছি (জীবন বৃক্ষে তাদের শাখাদ্বয় যত সাম্প্রতিককালে বিভক্ত হয়েছে), তাদের ডিএনএ, আরএনএ এবং প্রোটিন অণুক্রম বা সিকুয়েন্স তত কাছাকাছি হবে,তত মিল থাকবে। নীচের সারণিটি লক্ষ্য করুন। স্তন্যপায়ী বিভিন্ন প্রাণীর দেহের গ্রোথ হরমোনের জিন সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যকার বিবর্তনীয় সম্পর্ক বা জীবন বৃক্ষে কে কতটা কার সাথে নৈকট্যে অবস্থান করছে তার একটি তুলনামূলক চিত্র দেখা যায়(২০):

	শিম্পাঞ্জী	**তিমি**	**ডলফিন**	**জলহস্তী**	**উট**	**অ্যালপাক (alpaca)**
মানুষ	**৯৮**	**৭৯**	**৭৯**	**৭৯**	**৭৯**	**৮০**
শিম্পাঞ্জী		**৭৯**	**৭৯**	**৭৯**	**৭৯**	**৭৯**
তিমি			**৯৯**	**৯৭**	**৯৬**	**৯৬**
ডলফিন				**৯৭**	**৯৬**	**৯৬**
জলহস্তী					**৯৬**	**৯৪**
উট						**৯৯**

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমি-ডলফিন, উট-অ্যাল্প্যাক জোড়ায় নিজেদের মধ্যে ডিএনএ সিকুয়েন্সে শতকরা ৯৯ ভাগ সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষ-শিম্পাঞ্জির মধ্যে ডিএনএ সিকুয়েন্সে মিল শতকরা ৯৮ ভাগ। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে, বিবর্তনীয় জীবন বৃক্ষে (বর্তমানে জীবিত) অন্য যেকোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় মানুষ-শিম্পাঞ্জি পরস্পরের সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করছে। তেমনি তিমি-ডলফিন পরস্পরের সবচেয়ে নিকটে। বলা যায়, প্রাণী জগতে তারা পরস্পরের নিকট আত্মীয়। এরপর তাদের নিকটের স্তন্যপায়ী প্রাণী হচ্ছে জলহস্তী, তিমি-ডলফিনের সাথে যার ডিএনএ সিকুয়েন্সের মিল শতকরা ৯৭ ভাগ। একইভাবে বিবর্তনীয় জীবন বৃক্ষে মরুভূমির জাহাজ বলে খ্যাত উটের সবচেয়ে নিকট আত্মীয় দক্ষিণ আমেরিকার মেষ সদৃশ প্রাণী অ্যাল্প্যাক।

গবেষণাগারে ইতিমধ্যে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'কে নানাভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে, যেমন: 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন ওষুধের বিশেষত অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ও অনিয়মিত ব্যবহারের ফলে খুব দ্রুত জীবাণুগুলি ওষুধ-প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। এক সময় গনেরিয়া নামক যৌনরোগ চিকিৎসায় পেনিসিলিন ওষুধই ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ ওষুধের যথেচ্ছ আর অনিয়মিত ব্যবহারের কারণে এখন আর গনেরিয়া রোগ নিরাময়ে পেনিসিলিন ওষুধ কোনো কাজ করতে পারে না। গনেরিয়া রোগের জীবাণু গনোকক্কাস (Gonococcus) ব্যাকটেরিয়া ইতিমধ্যে পেনিসিলিন প্রতিরোধক হয়ে গেছে। ফলে এই রোগের চিকিৎসার জন্য এখন পেনিসিলিন থেকে শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একদম শেষের দিক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কীটনাশক হিসাবে 'ডিডিটি' (Dichlorodiphenyl Trichloroethane) স্প্রে করা হয়ে আসছে। ১৯৩৯ সালের দিকে সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানী পল মুলার (Paul Hermann Müller, 1899–1965) কীটনাশক হিসেবে ব্যবহারের জন্য ডিডিটি আবিষ্কার করেন। যার জন্য ১৯৪৮ সালে তিনি মেডিসিন বিভাগে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। আমাদের দেশেও একসময় সরকারিভাবে

ম্যালেরিয়া জীবাণু নির্মূলে ক্ষেত-খামারে যথেচ্ছ পরিমাণে ডিডিটি স্প্রে করা হতো। ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ, ম্যালেরিয়া রোগের ‘প্লাসমোডিয়াম’ এককোষী জীবাণু নির্মূলে মূলত ডিডিটি ব্যবহৃত করা হয়। যদিও ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্লাসমোডিয়ামের বিশাল সংখ্যক সদ্যস্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু ডিডিটি’র বিজয় ঘোষিত হয়নি। প্রায় নির্মূল হবার অবস্থার মধ্যে মিউটেশনের ফলে খুব অল্প সময়েই এসব কীটপতঙ্গ,ম্যালেরিয়া জীবাণুর জিনগত কাঠামো বদলে যায়। জিনগত কাঠামো বদলে যাওয়া কীটপতঙ্গ বা জীবাণুরা ‘ডিডিটি স্প্রে করা পরিবেশে’ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় টিকে গেছে এবং বংশবিস্তার করেছে। এর ফলে নতুন প্রজন্মের কীটপতঙ্গ-জীবাণু ডিডিটি বা এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত কীটনাশক যেমন ম্যালাথিয়ন (Malathion), সংশ্লেষিত পাইরেথ্রয়েড (Synthetic pyrethroids)-প্রতিরোধী হয়ে উঠে। অণুজীববিজ্ঞানীদের কাছে জীবাণুদের এই ধরনের মাল্টি-ড্রাগ প্রতিরোধী হয়ে ওঠা বিশাল সমস্যার ব্যাপার। এতে রোগ নির্মূল পদ্ধতি আরো জটিল হয়ে যায়।(২১) সুইডেনে ডিডিটি ব্যবহারের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৪৬ সালের বাসা-বাড়িতে যেসব মাছি পাওয়া যায় দেখা যায় এরা ডিডিটি-প্রতিরোধী হয়ে গেছে। ১৯৫১ সালের মধ্যে ইটালিতে মশা-মাছি শুধু ডিডিটি-প্রতিরোধী হয়ে যায়নি, নতুন ধরনের কীটনাশক যেমন Chlordane, methoxychlor, heptachlor -প্রতিরোধী হয়ে গেছে। এ ধরনের ঘটনা শুধু ডিডিটি’র ক্ষেত্রে ঘটে নি, কীটনাশক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাতে দেখা গেছে, যথেচ্ছ আর অনিয়মিত ব্যবহারের কারণে জীবাণু-কীটপতঙ্গেরা অনেক সময় মাত্র দুই থেকে আড়াই বছরের মাথায় কীটনাশক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে। তবে কীটনাশক-প্রতিরোধী সকল জীবের ‘প্রতিরোধ ক্ষমতা’ সমান নয়।’(২২) আমেরিকান কংগ্রেসের ১১০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচী ঘোষণা করে জাতিসংঘ ১৯৫৮ সালে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে পাঁচ বছরে চার লক্ষ টন ডিডিটি স্প্রে করা হয় সারা বিশ্বে এবং এতে ১৫ থেকে ২৫ মিলিয়ন জীবন রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ১৯৭২ সালের দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচিকে ‘মৃত’ বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে এ

কর্মসূচির পিছনে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন বন্ধ করে দেয়া হল বিশাল এই কর্মসূচিটি। কারণ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিরুদ্ধে খুব ধীর গতিতে এই কর্মসূচিটি পরিচালিত হচ্ছিল। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে একসাথে এ কর্মসূচি শুরু করা যায় নি সরকারি নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে। কর্মসূচি চলাকালে গবেষকরা দেখতে পাচ্ছিলেন ধীরগতিতে পরিচালিত কর্মসূচি তুলনায় মশা বা প্লাসমোডিয়াম জীবাণুর বিবর্তন প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে হচ্ছিল। এভাবে চলতে থাকলে ডিডিটি-'প্রতিরোধ ক্ষমতা' সম্পন্ন মশা বা প্লাসমোডিয়ামকে কখনও নির্মূল করা যাবে না। শুধু অর্থেরই অপচয় হবে। এছাড়া ডিডিটি' বিরুদ্ধে মারাত্মক আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে এটির যথেচ্ছ ব্যবহারে পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ঢেকে আনে। ক্ষেতখামারে ডিডিটি স্প্রে করা হলে বৃষ্টির পানিতে এটি ধুয়ে নদীর পানিতে গিয়ে মেশে। অথবা স্থানীয় জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। ডিডিটি'র রাসায়নিক প্রভাবের কারণে যেমন মাছের অকাল মৃত্যু ঘটে, তেমনি এই পানি পান করে ঈগল, কাক জাতীয় পাখির প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। গৃহপালিত পশুও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে প্রকৃতির স্বাভাবিক খাদ্যচক্র এতে বাধাগ্রস্থ হয়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত আমেকিার সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী রাসেল কারসন (Rachel Louise Carson, 1907–1964) তার Silent Spring বইয়ে ডিডিটি'র যথেচ্ছ ব্যবহারে আমাদের ইকোসিস্টেম যে কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে জনসচেতনতার মধ্যে নিয়ে আসেন। অবশ্য প্রথম দিকে জাতিসংঘ ঘোষিত ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচিতে ডিডিটি ব্যবহারে সফলতার হার খুব বেশিই ছিল। যেমন শ্রীলঙ্কায় ১৯৫৫ সালে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল দশ লক্ষেরও অধিক। ডিডিটি ব্যবহারে ১৯৬১ সালের হিসেবে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র দুই ডজনেরও কম। এই সফলতা অবশ্য পরবর্তীতে ধরে রাখা যায় নি। ঐ বছরের গবেষণায় দেখা গেছে শ্রীলঙ্কাতে মশা এবং ম্যালেরিয়া রোগের এককোষী জীবাণু প্লাসমোডিয়ামের নতুন প্রজন্মগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ডিডিটি এবং নতুন ধরনের ড্রাগ যেমন 'ক্লোরোকুইন' প্রতিরোধী হয়ে বিবর্তিত হয়ে

গেছে। (দ্রষ্টব্য : Stephen R. Palumbi, 135-138, ১৩৫-১৩৮)।

আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের Microbial Ecology বিভাগের অধ্যাপক রিচার্ড লেনস্কি (Richard Lenski) প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘসময় ব্যাপী গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছেন। ১৯৮৮ সালে রিচার্ড লেনস্কি ঊ. E. coli (Escherichia coli) ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ২০১০ সালের ফেব্র“য়ারি মাস পর্যন্ত ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়ার পঞ্চাশ হাজার প্রজন্মের উপর মিউটেশন, ভ্যারিয়েশন, নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজন, বেঁচে থাকার লড়াই, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করেছেন।□ প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়া প্রজাতিগুলোর এক প্রজন্মকাল খুব কম করে হলে মাত্র ১৫ মিনিট আর খুব বেশি হলে দিন কয়েক পর্যন্ত হয়ে থাকে। মানুষের এক প্রজন্মকাল ২৫ বছর। প্রাকৃতিক পরিবেশে E. Coli নামক ব্যাকটেরিয়ার এক প্রজন্মকাল ৬০ মিনিট কিন্তু ল্যাবরেটরির নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ই কোলাইয়ের চাষের সময় বাহির থেকে খাদ্য সরবরাহ করলে এর প্রজন্মকাল মাত্র ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, জীববিবর্তন জীবজগতের এক ধরনের বাস্তবতা আর সেই বাস্তবতাকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব'।

বলা হয়ে থাকে 'জীববিবর্তন (প্রাকৃতিক নির্বাচন) এমন একটি তত্ত্ব, যাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন (Falsify) করার কোনো সুযোগ নেই।' অভিযোগটি মোটেও সত্য নয়। এ তত্ত্বটি অবাস্তব-কল্পিত কোনো বক্তব্য-ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি যে, একে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার সুযোগ থাকবে না। জীববিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হচ্ছে জিনেটিক মিউটেশন। যার ফলে প্রজাতিতে বংশ পরম্পরায় ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব হয়। এখন কেউ যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারেন জীবদেহের

জননকোষে মিউটেশন ঘটে না কিংবা জননকোষে মিউটেশন ঘটে কিন্তু ঐ জীবের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তা প্রবাহিত হয় না, কিংবা প্রবাহিত হলেও বংশধরদের মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব হয় না, কিংবা পরিবর্তিত পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন জীব অভিযোজন ঘটাতে পারে না-তাহলে জীববিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বটি 'মিথ্যা' প্রমাণিত হয়ে যায়! কিন্তু তেমন কিছু এখনো হাজির হয় নি।

জীববিবর্তনের পক্ষে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে ফসিলবিদ্যা বা প্রত্নজীববিদ্যা থেকে। এখন পর্যন্ত এমন একটি ফসিলও পাওয়া যায় নি, যা জীববিবর্তনের 'জীবন বৃক্ষের' (tree of life) বিরোধী কিংবা ভূতাত্ত্বিক সময়কালের সাথে খাপ খায় না। যদি এমন কোন ফসিল উপস্থাপন করা যায়, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা (শারীরসংস্থান পরীক্ষা, ডিএনএ টেস্ট, রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং ইত্যাদি) দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে উক্ত ফসিল জীববিবর্তনের জীবন বৃক্ষ, ভূতাত্ত্বিক সময়কালের সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে জীববিবর্তন তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও তেমন কোনো ফসিল পাওয়া যায় নি।

ইংল্যান্ডের খ্যাতিমান জীববিজ্ঞানী এবং বংশগতিবিদ জে. বি. এস. হ্যালডেনকে (১৮৯২-১৯৬৪) একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'জীববিবর্তন তত্ত্বকে কিভাবে মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব?' উত্তরে হ্যালডেন জানিয়েছিলেন(২৩)-'কেউ যদি প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডের শিলাখণ্ডে একটি খরগোশের ফসিল আবিষ্কার করতে পারে, তবে জীববিবর্তন তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে।' কারণ জীববিবর্তনের ফসিল রেকর্ড অনুসারে প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান সময়ে (৪৫০০ থেকে ৫৪৩ মিলিয়ন বছর পূর্বে) শুধু সায়ানোব্যাকটেরিয়া (পূর্বে এদের ভুলভাবে 'নীলাভ-সবুজ শৈবাল' বলে ডাকা হত। কিন্তু 'সায়ানেব্যাকটেরিয়া' সত্যিকার অর্থে শৈবাল জাতীয় জীব নয়), ব্যাকটেরিয়া, আরকিয়ান জাতীয় জীবের অস্তিত্ব ছিল। মেরুদণ্ডী প্রাণী, উভচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। খরগোশ সম্পূর্ণ স্তন্যপায়ী প্রাণী, স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে ট্রায়াসিক পিরিয়ডে (২৪৮ থেকে ২০৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে)। সহজভাবে

বলতে গেলে জীববিবর্তনের ধারা অনুসারে এক কোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের উদ্ভব, এরপর আদিম অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণী; সামুদ্রিক প্রাণী মাছ থেকে চতুষ্পদী উভচর প্রাণী। উভচর প্রাণী থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী থেকে পাখি এবং স্তন্যপায়ী জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব। তাই প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শিলাখণ্ডে খরগোশ কিংবা অন্য কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেলে এক মুহূর্তেই জীববিবর্তন তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিবে।

জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নেস্ট মায়ার (১৯০৪-২০০৫) অবশ্য আরো সহজ করে বলেছেন: ‘সকল আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীই ১০০ থেকে ২০০ মিলিয়ন বছরের পুরাতন। স্তন্যপায়ী প্রাণী জিরাফের উদ্ভব ঘটেছে তিন কোটি (৩০ মিলিয়ন) বছর আগে মধ্য-টারশিয়ারি সময়কালে। এখন যদি ছয় কোটি বছর (৬০ মিলিয়ন) পূর্বে প্যালিয়োসিন সময়কালের শিলায় কোনো জিরাফের ফসিল পাওয়া যায়, তাহলে তাও জীববিবর্তন তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিবে।’(২৪)

এরপরও কথা থাকে। ‘বিজ্ঞান তো নিয়ত পরিবর্তনশীল; তার তত্ত্বগুলোও অনেক সময় পরিবর্তন হয়ে যায়। তাহলে তত্ত্বের মূল্য থাকে কই?’ অবশ্যই বিজ্ঞান স্থির কোনো কিছু নয়; স্থবির নয়। প্রতিনিয়তই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তত্ত্বগুলো তৈরি হয়, পূর্বের তত্ত্বগুলো ঝাচাই হয়, পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত-সংস্কার হয়। একটা উদাহরণ দিই : নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর একটি ফ্যাক্ট বা বাস্তবতা ‘মাধ্যাকর্ষণ শক্তি’কে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু ২৫০ বছর পরে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর ‘সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে’র মাধ্যমে দেখালেন, নিউটনের থিওরি কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক ফল দেয় না; যেমন যে সমস্ত জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব বেশি (যেমন ব্ল্যাকহোল), সে সমস্ত জায়গায় আলোর গতিপথ বেঁকে যায়। ১৯১৯ সালে ২৯ মে সূর্য গ্রহণের সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার ফ্র্যাঙ্ক ডাইসন আইনস্টাইনের (১৯১৫ সালে প্রদত্ত) সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি প্রমাণ করেন। যেহেতু ‘বিশেষ পরিস্থিতিতে নিউটনের

থিওরি অব গ্র্যাভিটি'র সীমাবদ্ধতা' আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে কি পৃথিবীতে অভিকর্ষ বলের বাস্তবতা বাতিল হয়ে গেছে? অর্থাৎ গাছ থেকে ফল এখন মাটিতে পড়ে না, শূন্যে ভেসে থাকে, উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়লে সেটা মাটিতে নেমে আসে না, সেটাও শূন্যে রয়ে যায়? মোটেও না। বাস্তবতা থিওরির উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে নেই। আবার নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্ব এখনও (বিশেষ পরিস্থিতি বাদে) যথেষ্ট পরিমাণে অভিকর্ষ বলকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে অনুকল্পটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বিশ্লেষণের পর বাস্তবতাকে সবচেয়ে ভালোভাবে এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারে, তাকেই 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে যদি দেখা যায়, বর্তমানে প্রচলিত তত্ত্বের চেয়ে আরো ভালো ব্যাখ্যা অন্য কোনো অনুকল্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পাওয়া যাচ্ছে, তখন বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই নতুন এই অনুকল্পকে 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এটা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, অত্যাবশ্যকীয় বৈজ্ঞানিক নীতিমালা। এভাবেই নতুন-উন্নততর তত্ত্বের মাধ্যমে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানের অগ্রগামিতা রচিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বও এর ব্যতিক্রম নয়। ভবিষ্যতে যদি কখনো দেখা যায়, নতুন কোনো অনুকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব থেকেও আরো ভালোভাবে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড বজায় রেখে জীবজগতের বিভিন্ন বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারছে, তখন নির্দ্বিধায় নতুন অনুকল্পটিকে 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের বাইরে আর একটিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই যা জীবজগতের বাস্তবতাগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করতে পারে, বিধায় এ তত্ত্বকে গ্রহণের কোনো বিকল্পও নেই।
আগ্রহী পাঠকের সুবিধার্থে নিম্নে জীববিবর্তন সম্পর্কে আমেরিকার প্রত্নজীববিদদের সংগঠন 'প্যালিওন্টোলজিক্যাল সোসাইটি'র বক্তব্য তুলে ধরা হল(২৫):

The Paleontological Society Position Statement: Evolution

Evolution is both a scientific fact and a scientific theory. Evolution

is a fact in the sense that life has changed through time. In nature today, the characteristics of species are changing, and new species are arising. The fossil record is the primary factual evidence for evolution in times past, and evolution is well documented by further evidence from other scientific disciplines, including comparative anatomy, biogeography, genetics, molecular biology, and studies of viral and bacterial diseases. Evolution is also a theory – an explanation for the observed changes in life through Earth history that has been tested numerous times and repeatedly confirmed. Evolution is an elegant theory that explains the history of life through geologic time; the diversity of living organisms, including their genetic, molecular, and physical similarities and differences; and the geographic distribution of organisms. Evolutionary principles are the foundation of all basic and applied biology and paleontology, from biodiversity studies to studies on the control of emerging diseases.

Because evolution is fundamental to understanding both living and extinct organisms, it must be taught in public school science classes. In contrast, creationism is religion rather than science, as ruled by the Supreme Court, because it invokes supernatural explanations that cannot be tested. Consequently, creationism in any form (including "scientific creationism," "creation science," and "intelligent design") must be excluded from public school science classes. Because science involves testing hypotheses,

scientific explanations are restricted to natural causes.

This difference between science and religion does not mean that the two fields are incompatible. Many scientists who study evolution are religious, and many religious denominations have issued statements supporting evolution. Science and religion address different questions and employ different ways of knowing.

The evolution paradigm has withstood nearly 150 years of scrutiny. Although the existence of evolution has been confirmed many times, as a science evolutionary theory must continue to be open to testing. At this time, however, more fruitful inquiries address the tempo and mode of evolution, various processes involved in evolution, and driving factors for evolution. Through such inquiry, the unifying theory of evolution will become an even more powerful explanation for the history of life on Earth.

উৎসনির্দেশঃ

(১) 'শিক্ষানবিস, প্রসঙ্গ 'বিবর্তন': জাকির নায়েকের মিথ্যাচার, যুক্তি, সংখ্যা ৩, সিলেট, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, জানুয়ারি ২০১০, পৃ ১৩৮

(২) বিজ্ঞানের কর্ম-প্রক্রিয়া জানতে এই ওয়েব সাইটটি দেখুন: Understanding Science: how science really works,

http://undsci.berkeley.edu/article/howscienceworks_01

(৩)Michael Shermer, Why Darwin Matters, New York, Henry Holt and Company, LLC, 2007, pp. 93-99

(৪) চার্লস রবার্ট ডারউইন, প্রজাতির উৎপত্তি, (ভাষান্তর: ম. আখতারুজ্জামান), ঢাকা, বাংলা একাডেমী,

২০০০, পৃ বিশ-একুশ (অনুবাদকের কথা)

(৫) http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_25

(৬) http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=agricultures-sustainable-future

(৭) দ্বিজেন শর্মা, চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ ২৪-২৫

(৮) Peter Savolainen et al., Genetic Evidence for an East Asian Origin of Domestic Dogs, Science, 22 November 2002, Vol. 298, no. 5598, pp. 1610-1613 pp. 202-203

(৯) Mark Pallen, The Rough Guide to Evolution, USA, Rough Guides Ltd, 2009,

(১০) Charles Darwin, The Origin of Speicies, Delhi, W. R. Goyal Publishers, 2006, pp. 90, 109

(১১) সার্ন এবং এলএইচসি প্রকল্প সম্পর্কে জানতে দেখুন:
http://public.web.cern.ch/public/Welcome.html Ges
http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider

(১২) Edward J. Larson, Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory, New York, Modern Library, 2006, p. 62

(১৩) http://www.avert.org/worldstats.htm

(১৪) Stephen R. Palumbi, The Evolution Explosion: How Humans Cause Rapid Evolutionary Change, New York, W.W. Norton & Company, 2002, pp. 95-130

(১৫) Peter R. Grant & B. Rosemary Grant, How and Why Species Multiply: The Radiation of Darwin's Finches, Princeton University Press, 2007 Ges Jonathan Weiner, The Beak of the Finch: A Story of Evolution in Our Time, Vintage, 1995.

(১৬) Sean B. Carroll, The Making of the Fittest: DNA and the ultimate forensic record of evolution, London, Quercus, 2009, pp. 59-60, 222-225

(১৭) Sean B. Carroll, Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo, New York, W. W. Norton, 2005, P. 102

(১৮) Eva Jablonka and Marion J. Lamb, Evolution in Four Dimensions, England, MIT Press, 2006, pp. 11- 12

(১৯) জীবন বৃক্ষ নিয়ে সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে দেখুন (আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইলেকট্রনিক

পাম্পলেট): www.ucjeps.berkeley.edu/tol.pdf

(২০) Daniel J. Fairbanks, Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in Human DNA, New York, Prometheus Books, 2010, p. 126

(২১) Stuart B. Levy, The Antibiotic Paradox: How the Misuse of Antibiotics Destroys Their Curative Powers, 2nd ed. USA, Perseus Publishing, 2002, p. 112

(২২) ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, বংশগতি ও জিনের অসুখ, কলকাতা, পাভলভ ইনস্টিটউট, ২০০১, পৃ ৪৪-৪৫

(২৩) Richard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, 2006, p. 128

(২৪) Ernst Mayr, What Evolution is, Orion Publishing Group, 2002, p. 20

(২৫) The Paleontological Society, USA, Web site: http://www.paleosoc.org/evolutioncomplete.htm

অতিরিক্ত পাঠঃ

- Evolution is a Fact and a Theory, Laurence Moran, The Talk Origin Archive, http://www.talkorigins.org/faqs/evolution-fact.html
- T. Ryan Gregory, Evolution as Fact, Theory, and Path, http://www.gregorylab.org/reprints/FactTheoryPath.pdf
- Carl Zimmer, A New Step In Evolution, http://scienceblogs.com/loom/2008/06/02/a_new_step_in_evolution.php
- Richard Lenski Experimental Evolution, http://myxo.css.msu.edu/ecoli/

ডারউইন: একজন বিজ্ঞানীর প্রতিচ্ছবি

"A brilliant mind, great intellectual boldness, and an ability to combine the best qualities of a naturalist observer, philosophical theoretician, and experimentalist-the world has so far seen such a combination only once, and it was in the man Charles Darwin."-Ernst Mayr

ঐতিহাসিক কাল পৃথক পৃথক আইডিয়া দ্বারা পরিচালিত হয়। যাকে বলা যেতে পারে 'Zeitgeist'। গ্রিক দর্শন থেকে শুরু করে খ্রিস্টধর্ম, রেনেসাঁর ভাবনা, আলোকায়ন যুগ ইত্যাদি হচ্ছে কতিপয় উদাহরণ; আমাদের ইতিহাসের অধ্যায়সমূহ যারা একেক সময়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এক পিরিয়ড থেকে আরেক পিরিয়ডে খুব কম সময়েই ক্রমউন্নতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক উন্মেষের মাধ্যমে এ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক অভ্যুত্থান সাধন করেছে ডারউনীয় বিপ্লব। এটি একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। পশ্চিমা বিশ্বের যার জন্ম ঘটে **১৮৫৯** সালে ডারউইনের অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থ প্রকাশের পর। ডারউইনীয় বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি আগের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর তুলনায় কিছুটা পৃথক। আজকের যুগে একজন আধুনিক মানুষের কাছে কোনোভাবেই সম্ভব নয় দেড়শ বছর আগে ফিরে গিয়ে প্রাক-ডারউইনীয় পিরিয়ডের চিন্তাভাবনা পুনর্গঠন করা। ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব আমাদের জীবনে বিশাল।

ডারউইন স্বয়ং এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লবের অবতারণা ঘটিয়েছেন, যখন তিনি জীববিজ্ঞানের সীমান্তের অতি মৌলিক কিছু বিশ্বাসের উৎখাত ঘটান। উদাহরণস্বরূপ ডারউইন প্রত্যেক প্রজাতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি সম্পর্কিত বিশ্বাসকে বাতিল করেছেন এবং তার বদলে প্রতিস্থাপিত করেছেন সকল জীবের একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত হওয়ার ধারণাকে। এমন কি, তিনি এই ভাবনার প্রচলন ঘটান, মনুষ্যপ্রজাতি কোনো বিশেষ সৃষ্টি নয়, বিশ্বের অন্যান্য সকল জীবের মত সেও বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক পৃথিবী সম্পর্কে প্রচলিত পরিকল্পিত ডিজাইন ভাবনার বদলে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার ধারণার বিস্তার ঘটান তিনি। ডারউইনের এই পরিবর্তন এবং অভিযোজনের মাধ্যমে সংঘটিত বিবর্তনের তত্ত্ব ভিক্টোরীয় উন্নতি আর উৎকর্ষ সাধনের ভাবনার প্রতি পুরোপুরিই বিপরীতাত্মক ছিল। ডারউইনীয় বিবর্তন মোটেই কোনো জীবের উন্নতি সাধনের জন্য , কিংবা জীবের নিখুঁত রূপ দানের জন্য পরিচালিত হয় না।

আরো বলা যায়, ডারউইন জীববিজ্ঞানী হলেও, তিনি দর্শন শাখায় নতুন মতের জন্ম দেন। যখন বিজ্ঞানের দর্শন পদার্থবিদ্যার গাণিতিক সূত্র এবং ডিটারমিনজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল, সেখানে বিজ্ঞানের ডিসকোর্সে ডারউইন নিয়ে আসেন সম্ভাব্যতা, আকস্মিকতা এবং অদ্বিতীয়তা। তার কর্মের মৌলিক নীতিটিই ছিল জ্ঞান অর্জনের পরীক্ষণের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পর্যবেক্ষণ এবং কার্যকর-অর্থপূর্ণ অনুকল্প গঠন।

ডারউইন যদি জীববিবর্তন সম্পর্কে একটি শব্দও না লিখতেন, তাতেও তিনি একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। বিবর্তনীয় বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন যেমনটা বলেছেন জীববিজ্ঞানে ডারউইনের মূল কাজ কিন্তু তার জীববিবর্তন তত্ত্ব নয়, বরং জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি যে উদ্ভিদবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক দিক সম্পর্কে ধারাবাহিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেটাই ডারউইনের মূল কাজ। অথচ, ডারউইনের এই ভূমিকা সম্পর্কে জীববিজ্ঞান-বিচ্ছিন্ন লোকেরা খুব কমই জানে।

এমন কি তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ফুলের অভিযোজন, প্রাণীর মনস্তত্ত্ব, এবং শামুক, কেঁচো সম্পর্কিত গবেষণাগুলো। জ্ঞানের এই সব শাখায় ডারউইন ছিলেন অগ্রগণ্য। ডারউইন-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যায় বলিষ্ঠ তত্ত্ব প্রদান করেছেন, যা আজকের যুগের শ্রেণীবিন্যাসবিদরা অনুসরণ করছেন। সেসময় জৈবভূগোল সম্পর্কে তার উপস্থাপনা এ্তোই জোরালো ছিল, ডারউইনের মৃত্যুর দেড়শ বছর পরও আধুনিক জৈবভূগোল শাখায় ডারউইনের দেয়া জীবের ইকোলজি, আচরণ, বিন্যাস ইত্যাদি এখনও পুরোপুরি অনুসৃত হয়ে যাচ্ছে।

ডারউইন নামের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি কে? কেমন করেই বা তিনি তার ধারণাগুলো লাভ করলেন? তার এই সাফল্যের পিছনে মূল কারণগুলো কি কি? এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে এই বিষয়গুলোর উপরই আলোকপাত করা হবে।

ব্যক্তি ও তার কর্ম

চার্লস ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯ সালে ইংল্যান্ডের শ্রুসবারিতে। তার পিতা ড. রবার্ট ডারউইন সেসময়ের একজন প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। রবার্ট ডারউইনের ছয়জন ছেলেমেয়ের মধ্যে ডারউইনের অবস্থান পঞ্চম এবং কনিষ্ঠ পুত্র তিনি। ডারউইনের দাদা ইরাসমাস ডারউইন, তিনি জুনোমিয়া (Zoonomia) নামের গ্রন্থের লেখক, যে গ্রন্থটি পরবর্তীতে তার নাতি চার্লস ডারউইনকে জীবজগতের বিবর্তন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। ডারউইনের মা (প্রতিষ্ঠিত মৃৎশিল্প ব্যবসায়ী জোশোয়া ওয়েজউডের কন্যা) ডারউইনের মাত্র ৮ বছর বয়সে মারা যান। পরবর্তীতে তার বড় বোন তাকে লালন পালন করেন।

কিশোর বয়সে ডারউইন ছিলেন প্রকৃতির একান্ত অনুরাগী। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমি জন্ম নিয়েছি প্রকৃতিবিদ হয়ে'। তিনি মাছ ধরা থেকে শুরু করে শিকার করা এগুলো খুব পছন্দ করতেন। ভালোবাসতেন প্রকৃতি নিয়ে বইপুস্তক পাঠ

করতে। শ্রুসবারি ইংল্যান্ডের এমন একটি শহর ছিল সেসময় খুব বেশি শিল্পায়িত ছিল না আবার খুব প্রান্তিক পর্যায়েও ছিল না, শহরের অধিবাসী তখন ছিল হাজার বিশেক। একজন প্রকৃতিবিদের বেড়ে উঠার জন্য এই শহরের পরিবেশ ছিল খুব উপযুক্ত।

স্কুলের এই বাঁধা-ধরা নিয়ম, দীর্ঘ ক্লাস, পড়ালেখা এগুলো এই কিশোর প্রকৃতিবিদের মোটেই পছন্দের ছিল না। সতের বছর হওয়ার আগেই ডারউইনের বাবা তাকে পাঠিয়ে দেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিনে লেখাপড়ার জন্য। ডারউইনের বড় ভাইও সেখানে মেডিসিনে লেখাপড়া করছিলেন। কিন্তু মেডিসিনে লেখাপড়ার থেকে ডারউইন বাইরের প্রকৃতি দর্শনেই ব্যস্ত সময় কাটাতে লাগলেন। যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল ডারউইনের দ্বারা চিকিৎসাবিদ্যায় লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন তার বাবা ভর্তি করে দেন ক্যামব্রিজে থিওলজি নিয়ে লেখাপড়ার করার জন্য। সময়টা তখন ১৮২৮ সাল। এটা অবশ্য মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল সেসময়, কারণ ঐ যুগে ইংল্যান্ডের বড় বড় প্রকৃতিবিদ যেমন উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জে. এস. হেনস্লো, ভূতত্ত্বের অধ্যাপক এডাম সেজউইকসহ অনেকেই ধর্মবিদ্যায় লেখাপড়া করেছিলেন একসময়। ক্যামব্রিজে এসে ডারউইন মোটামুটি মুক্ত সময় পেলেন। তিনি সে সময় গোবরে পোকা সংগ্রহ করতেন, উদ্ভিদবিদ্যা এবং ভূতত্ত্বের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করতেন প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, আবার সময় পেলে শিকারে চলে যেতেন, ঘোড়া দৌঁড়াতেন। এত ফাঁকিবাজির পরও পরীক্ষায় তার ফলাফল বেশ ভালো হয়েছিল। ১৮৩১ সালে বি.এ. পাস করেন, তখন মেধাতালিকায় তার অবস্থান ছিল দশম। আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ক্যামব্রিজে যখন তার লেখাপড়া শেষ হয়ে যায়, ততদিনে পুরোদস্তুর প্রকৃতিবিদ হয়ে যান।

পাঠ্যক্রম শেষ হয়ে যাওয়ার কিছুদিনের মাথায় ডারউইনের কাছে একটি আমন্ত্রণ আসে, এইচ. এম. এস. বিগল জাহাজে প্রকৃতিবিদ হিসেবে বিশ্বভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। সঙ্গে থাকবেন জাহাজের ক্যাপ্টেন রবার্ট ফিট্জরয়। ফিট্জরয়কে দায়িত্ব দেয়া

হয়েছে আগের থেকে ভালো মানচিত্র তৈরির জন্য সার্ভে করার জন্য প্যাটাগোনিয়া, টিয়েরা দ্যা ফিউজো, পেরু ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে। যাত্রার শুরুতে ধারণা করা হয়েছিল দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে, কিন্তু পরবর্তীতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছর। ডিসেম্বরের ২৭, ১৮৩১ সালে যখন বিগল জাহাজটি যাত্রা শুরু করে প্লাইমাউথ বন্দর থেকে, ডারউইন তখন ২২ বছরের যুবক। এবং ইংল্যান্ডে ফিরে আগে বিগল জাহাজটি ২ অক্টোবর, ১৮৩৬ সালে। ডারউইন এই পাঁচটি বছর পরিপূর্ণতার সাথে কাটিয়েছেন। তার সেই ভ্রমণকাহিনিতে (Journal of Researches) তিনি বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন, আগ্নেয়গিরি থেকে শুরু করে কোরাল দ্বীপ, ব্রাজিলের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জঙ্গল ইত্যাদিসহ প্যাটাগোনিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বৃক্ষহীণ তৃণপ্রান্তর, চিলি থেকে আর্জেন্টিনা, আরো আরো অনেক কিছু। প্রত্যেকদিনই অবিস্মরণীয় সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতেন, যা পরবর্তীতে জীবনের পথ চলায় প্রচুর সহযোগিতা করেছে। ভ্রমণকালে তিনি বিভিন্ন গ্রুপের জীবের নমুনা সংগ্রহ করতেন, প্যাটাগোনিয়া থেকে ফসিল সংগ্রহ করেছেন, ভূতত্ত্ব বিষয়ে বোঝার জন্য প্রচুর সময় দিয়েছেন, তবে চেয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন প্রকৃতিকে, নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতেন কেমন করে আর কেনইবা প্রকৃতির নিয়ম পরিচালিত হয়। তিনি নিজের মনেই ভূতাত্ত্বিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আর জীবের জীবন নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন কেন এমনটি হল। ডারউইনের এই গুণাবলীটুকু ছিল তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলতেন জীবজগত সম্পর্কে আবার উত্তর সংগ্রহের জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করে যেতেন। তার এই বৈশিষ্ট্যই তাকে বড়মাপের একজন বিজ্ঞানী বানিয়েছে।

জাহাজে অবস্থানকালে খারাপ আবহাওয়া আর সমুদ্র অসুখে ভোগার ফাঁকে যেটুকু সময় তিনি পেতেন তা কাজে লাগাতেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠে, বইগুলো তিনি যাত্রায় আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। চার্লস লায়েলের দুই খণ্ডের 'প্রিন্সিপালস অব জিওলজি'(১৮৩২) বাদে আর কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বোধহয় ডারউইনকে বিশ্লেষণী চিন্তায় উজ্জীবিত করতে পারেনি। লায়েলের বর্ণিত

আনইনফরমিটারিয়ান ভূতত্ত্ব, ভূপৃষ্ঠ দীর্ঘসময় ধরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে, আবার তিনি ফরাসি জীববিজ্ঞানী জ্যাঁ ব্যাপতিস্ত ল্যামার্কের বক্তব্যের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি এবং লায়েলের বক্তব্য শেষমেশ বিবর্তন সংক্রান্ত ভাবনার বিরুদ্ধে ছিল।

ডারউইন যখন বিগল অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি পুরোপুরি প্রজাতির অপরিবর্তনীয়তায় বিশ্বাস করতেন, যেমনটা লায়েল থেকে শুরু করে ক্যামব্রিজের তার শিক্ষকেরা পর্যন্ত করতেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণকালে তার এই বিশ্বাস বেশ ধাঁধার মুখোমুখি হয়। ১৮৩৫ সালের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর তিনি যখন গ্যালাপোগোস দ্বীপপুঞ্জে যান ভূতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য, সেসময় তিনি মারাত্মক কিছু প্রমাণ পান, যদিও সেগুলোর গুরুত্ব সেসময় বুঝতে পারেন নি। নয় মাস পর, ১৮৩৬ সালের জুলাই মাসে তিনি যখন কলম ধরছিলেন তার ডায়রিতে : “When I see these islands in sight of each other and possessed of but a scanty stock of animals, tenanted by these birds but slightly differing in structure and filling the place in nature, I must suspect they are varieties ... if there is the slightest foundation for these remarks, the zoology of the archipelagoes will be worth examining: for such facts undermine the stability of species.”

ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর, অক্টোবর, ১৮৩৬ সালে, ডারউইন তার সংগৃহীত বিভিন্ন ফসিল, জীবিত প্রাণীর নমুনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠালেন পর্যাপ্ত তথ্যের জন্য, বিগল ভ্রমণের অফিসিয়াল হিসাব রাখার জন্য। মার্চ, ১৮৩৭ সাল, ডারউইন গ্যালাপোগাস দ্বীপপুঞ্জের তিনটা পৃথক দ্বীপ থেকে সংগৃহীত মকিংবার্ডগুলো (Mimus) পাঠালেন ইংল্যান্ডের খ্যাতিমান পাখি-বিশেষজ্ঞ জন গোল্ডের কাছে। জন গোল্ড জানালেন এগুলো কোনো ভ্যারাইটি নয়, স্বতন্ত্র তিনটি প্রজাতি। ভৌগলিক প্রজাতি-গঠনের (Geographic Speciation) বিষয়টি ডারউইন এই প্রথম বুঝতে

পারেন: যখন কোনো জীবের পপুলেশন তার পৈত্রিক প্রজাতি থেকে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এই ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা থেকে ক্রমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ আরো বলা যায়, যদি মকিংবার্ডগুলো যদি কোনো একক দক্ষিণ আমেরিকান পূর্বপুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে গ্যালাপোগাস দ্বীপগুলোতে উপনিবেশ গড়ে তুলে এবং সেখান থেকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রজাতি উদ্ভব হতে পারে, তাহলে মূল ভূখণ্ডের মকিংবার্ডের সকল প্রজাতিগুলোও পূর্বের কোনো না কোনো সময়ে কোনো পূর্বপুরুষ প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ডারউইনের লেখা অনেক ডায়রি, লেখনী থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে, ১৮৩৭ সালের বসন্ত ঋতুর সময়কালেই তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকেন নতুন প্রজাতিগুলো ভৌগলিক প্রজাতি-গঠনের মাধ্যমে ক্রমবিকাশের পথ ধরে উদ্ভূত হয়েছে এবং সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে প্রজাতির উদ্ভব ঘটে, যা তার জীববিবর্তন তত্ত্বের মূল বক্তব্য। কিন্তু জীববিবর্তনের প্রক্রিয়া 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে ডারউইনের আর দেড় বছর পার হয়ে যায়। আর এই আবিষ্কারটি ঘটে ১৮৩৮ সালের সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখে। ডারউইন তখন পড়ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের লেখা 'Essay on the Principle of Population'।

পরের বছরের শুরু দিকে, ১৮৩৯ সালের জানুয়ারিতে ডারউইন বিয়ে করেন তার কাজিন এমা ওয়েজউডকে এবং সেপ্টেম্বর ১৮৪২ সালের তারা লন্ডন ছেড়ে পাড়ি জমান পাশেরই (দক্ষিণ লন্ডন থেকে মাত্র ১৬ মাইল দূরে) ছোট্ট গ্রাম ডাউনে। এই গ্রামেই ডারউইন মৃত্যুর (১৯ এপ্রিল, ১৮৮২) আগ পর্যন্ত বসবাস করেন। ডারউইনের স্বাস্থ্যের জন্য তখন আসলে এ ধরনের নিরিবিলি-শান্ত পরিবেশের দরকার ছিল। দীর্ঘ ত্রিশটি বছর এই ডাউন গ্রামে ছিলেন, দেখা যেতো অনেক সময়ই তিনি দিনে দুই থেকে তিন ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম করতে পারতেন না, এমনও সময় গেছে মাসাধিকাল ধরে ডারউইন সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতেন। ডারউইনের এই রোগের প্রকৃতিটা

কি ছিল, তা এখনও সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়নি, এ নিয়ে অনেক বির্তক রয়েছে, কিন্তু তার রোগের উপসর্গগুলো মোটামুটি স্নায়ুবৈকল্যকে নির্দেশ করে।

প্রজাতির উদ্ভব

ডারউইন তার জীববিবর্তন তত্ত্বখানি প্রায় বিশ বছর ধরে অপ্রকাশিত রেখেছিলেন, এমন কি তিনি যখন তার রচনার প্রাথমিক খসড়া লিখছিলেন, সেই ১৮৪২ থেকে ১৮৪৪ সালের দিকে। এ বছরগুলিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন ভূতত্ত্বের উপর বই এবং রচনায়, শামুক (Cirripedia) নিয়ে দুই খণ্ডের প্রতিবেদন লেখায়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে জীববিবর্তনের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পরও ডারউইন কেন আটটি বছর পার করে দিয়েছিলেন শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যার উপর লেখালেখিতে? আধুনিক ইতিহাস গবেষকরা যেমন এম. টি. গিসেলিন M. T. Ghiselin) এবং অন্যান্যরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন ডারউইনের এই শামুক নিয়ে গবেষণা, শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যা, অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, ওনটোজিনেটিক গবেষণা মোটেই সময়ের অপচয় ছিল না। এগুলো থেকে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, 'প্রজাতির উদ্ভব' গ্রন্থখানি রচনায় এই গবেষণাগুলোর ভূমিকা অপরিসীম।

অবশেষে, ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে ডারউইন তার দীর্ঘদিনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীববিবর্তন নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। ভেবেছিলেন এটা বোধহয় অনেক বড় গ্রন্থ হবে। প্রায় দুই বছর তিনি যখন তার গ্রন্থের প্রথম নয় কি দশ অধ্যায় লেখা শেষ করলেন, তখন তার হাতে আসে ইংল্যান্ডের আরেক প্রকৃতিবিদ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের লেখা একটি চিঠি। ওয়ালেস তখন মালয় দ্বীপপুঞ্জে অবস্থান করছিলেন। যে চিঠিটি ১৮৫৮ সালের জুন মাসে ডারউইনের কাছে পৌঁছায়, তা আসলে লেখা হয়েছে, চিঠির সাথে সংযুক্ত একটি পাণ্ডুলিপি। ডারউইন যেন পাঠ করে উপযুক্ত মনে করলে কোনো জার্নালে পাঠিয়ে দেন প্রকাশের জন্য।

ডারউইন চিঠিটি পাঠ করে যেন বজ্রাহত হন। ডারউইন যা এতদিন ধরে ভেবে এসেছিলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে জীববিবর্তন তত্ত্বখানি ওয়ালেসের রচনাতেও আছে। পহেলা জুলাই, ১৮৫৮ সালে ডারউইনের সুহৃদ চার্লস লায়েল এবং উদ্ভিদবিদ জোসেফ হুকার ডারউইনের একটি রচনা এবং চিঠি এবং ওয়ালেসের রচনা লেখকদের পক্ষ হয়ে পাঠ করেন লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির সভায়। স্বতন্ত্রভাবে ডারউইন এবং ওয়ালেসের একই ধরনের আবিষ্কার এই সভায় ঘোষিত হয়। ডারউইন প্রজাতির উদ্ভব নিয়ে দীর্ঘ গ্রন্থ লেখার পরিকল্পনা স্থগিত করেন এবং ভূমিকা হিসেবে তিনি যা লিখতে চেয়েছিলেন, সেটাই শেষ করতে ব্রতী হন। শেষে ডারউইনের দীর্ঘ গ্রন্থের ভূমিকাটুকুই 'প্রজাতির উদ্ভব' শিরোনামে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর তারিখে।

'প্রজাতির উদ্ভব' গ্রন্থখানির পাঠপ্রতিক্রিয়া ছিল অভাবনীয়। খুব দ্রুতই এটি পরিচিতি পায় 'যে গ্রন্থ দুনিয়াকে নাড়া দিয়েছে' হিসেবে। প্রকাশের প্রথম বছরই ৩,৮০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়, এবং ডারউইনের জীবদ্দশায় শুধুমাত্র ব্রিটিশ সংস্করণই বিক্রি হয়েছে ২৭ হাজার কপি। এর বাইরে আমেরিকান প্রিন্টিং ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনুদিত হয়েছে। এবং এখনও চলছে। বর্তমানের সকল আলোচনাতেই দেখা যায় ওঠে আসে মানুষের ভবিষ্যৎ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, জীবনসংগ্রাম, মানবজীবন এবং এ দুনিয়ার উদ্দেশ্য, প্রকৃতিতে মানুষের অবস্থান এবং শেষে ডারউইন।

প্রজাতির উদ্ভব প্রকাশের শেষের তেইশ বছর ডারউইন নিজেকে ব্যস্ত রাখে জীববিবর্তন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে, যেগুলো তার প্রজাতির উদ্ভব গ্রন্থে সন্নিবেশ করতে পারেননি। তার দুই খণ্ডের লেখা The Variation of Animals and Plants under Domestication (১৮৬৮) বইয়ে জীবের জিনেটিক ভ্যারিয়েশন উদ্ভবের সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেন। The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (১৮৭১) গ্রন্থে মানুষের বিবর্তন এবং তার যৌন নির্বাচন তত্ত্ব বর্ধিত আকারে ব্যাখ্যা করেন। পরের বছর লেখা The

Expression of the Emotions in Man and Animals ((১৮৭২) প্রাণীর আচরণ নিয়ে গবেষণার ভিত্তি দাঁড় করান। Insectivorous Plants (১৮৭৫) গ্রন্থে বর্ণনা করেন সূর্যরশ্মির সাথে উদ্ভিদের অভিযোজন এবং অন্যান্য উদ্ভিদ কিভাবে পোকামাকড় শিকার করে এবং হজম করে। The Effect of Cross and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom (১৮৭৬),The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species (১৮৭৭),The Power of Movement in Plants (১৮৮০) গ্রন্থাবলীতে ডারউইন উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং তার শারীরবৃত্তিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন। সর্বশেষে The Formation of Vegetable Mold., through the Action of Worms, with Observation on Their Habits (১৮৮১) গ্রন্থে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে কেঁচোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

একজন ব্যক্তির জীবনে এত বিশাল কর্মযজ্ঞ সাধন করা কিভাবে সম্ভব হল, যেখানে ঐ ব্যক্তিকে প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকতে হত। শহর থেকে দূরে নিরিবিলি পরিবেশে থাকার দরুন নিবিষ্ট মনে একাগ্রচিত্তে ডারউইন তার কর্মসম্পাদন করে যেতে পেরেছেন। বংশগত যে সৌজন্যতাবোধ ডারউইন তার পরিবার থেকে পেয়েছেন, এর মাধ্যমেই তিনি বিভিন্ন কমিটির সদস্য, দাওয়াত ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করে যেতেন। তবে ডারউইন বিজ্ঞানের জগৎ থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। মাঝে মাঝে লন্ডনে গিয়ে বিজ্ঞানীদের সভায় উপস্থিত হতেন। এবং একজন আদর্শ স্বামী ও আদর্শ পিতার মত তিনি তার স্ত্রী ও দশ সন্তানের দায়িত্ব পালন করতেন।

ডারউইনকে ছিলেন অতিসজ্জন এবং ভদ্রলোক, যিনি অন্যের অনুভূতি আহত হবে বলে নিজের পথ ছেড়ে দিতে রাজি থাকতেন। শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারতেন, কোনো ধরনের সম্মান বা প্রাপ্তির আশায় নয়। তার প্রকাশনায় তিনি ছিলেন বিজ্ঞানীদেরও বিজ্ঞানী। তিনি সাধারণ পাঠকদের কথা

ভেবে কোনো গ্রন্থ লেখেন নি। যখন তার কোনো কোনো গ্রন্থ খুব বিখ্যাত হয়ে যায়, তিনি যারপর নাই অবাক হয়ে যেতেন।

তথাপি, বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে ডারউইনকে তার আবিষ্কার, কর্মের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য লড়াই করতে হয়েছে এবং তার খুব স্বল্পসংখ্যক সমর্থক, সুহৃদ ছিল। তারা হলেন চার্লস লায়েল, জোসেফ ডাল্টন হুকার, অঙ্গসংস্থানবিদ টমাস হেনরি হাক্সলি, যাকে প্রায় সময়ই ডারউইনের 'বুলডগ' হিসেবে অভিহিত করা হত, কারণ তিনি প্রায়ই ডারউইনের তত্ত্বের সমর্থনে গণসম্মুখে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। ডারউইনের অনুরাগীরাও প্রকৃতিবিদ ছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে যাদের নাম, জীববিবর্তন তত্ত্বের সহআবিষ্কারক আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, কীটতত্ত্ববিদ হেনরি ওয়াল্টার বেটস এবং প্রকৃতিবিদ ফ্রিজ মুলার।

স্বল্পসংখ্যক এই সুহৃদ এবং অনুরাগী ডারউইনের জন্য খুব দরকারি ছিলেন; কারণ তাকে প্রায় সময়ই কূটতর্কের আক্রমণের মুখে পড়তে হত। ১৮৬০ সালে আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানী লুইস আগাসিজ ডারউইনকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে বলেন, "ডারউইনের তত্ত্ব হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত ভুল, বাস্তবক্ষেত্রে এটি অসত্য, এর পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক এবং অশুভ উদ্দেশ্যে রচিত।"প্রজাতির উদ্ভব গ্রন্থটি ঐ সময়ে নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মনেতা, সাহিত্যিক ইত্যাদি শ্রেণী পেশার লোকের দ্বারা রিভিউ হয়েছে বিভিন্ন জার্নালে। এই রিভিউগুলোর বেশির ভাগই ছিল নেতিবাচক নয়তো আক্রমণাত্মক। আশ্চর্যের বিষয় ডারউইনের মৃত্যুর এতো বছর পরে এসে আজও একটি বিশেষ গ্রুপ থেকে ডারউইনের প্রতি বিষোদগার লক্ষ্য করা যায়।

ডারউইনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

যে বছর ডারউইন তার এই বৃহৎ গ্রন্থের খসড়া লেখায় ব্যস্ত সেসময় বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে ইংল্যান্ডে জোরালো আলোচনা চলছিল। ছাত্রজীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক জন

হার্শেলের লেখা Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy (১৮৩০) গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন। এটি তার ছিল পঠিত প্রিয় বইগুলোর মধ্যে একটি। তিনি উইলিয়াম ওয়েহুয়েল এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখার সাথেও পরিচিত ছিলেন। প্রকৃতির ইতিহাস গবেষণায় তিনি চেষ্টা করতেন তার প্রিয় লেখকদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে। এই ধরনের অনুসরণ বজায় রাখা আসলেই কঠিন, কারণ একেক সময় একাধিক লেখকের মতামত পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়, তাই ডারউইনকে নিজের বক্তব্য নিয়ে আসতে হতো প্রয়োজন অনুযায়ী। ডারউইনের অনেক পাঠকই মনে করেন ডারউইন পুরোপুরি বেকনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যাকে বলে সোজা আরোহী পদ্ধতি। ডারউইনের মধ্যে এই গুণটি ছিল যে কোনো বিষয় সম্পর্কে অপ্রত্যাশিত হলেও সঠিকভাবে ভাবতে পারতেন। তিনি জানতেন, এমনিতে কেউ পর্যবেক্ষণ করতে পারে না, যদি না তার কাছে সঠিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা লব্ধ অনুকল্প না থাকে। সেই জন্যই হেনরি ফোসেটকে লেখা এক চিঠিতে ডারউইন লিখেছিলেন, "আমার কোনো সন্দেহ নাই, একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির লাগাম ধরা থাকলে সে ভালো পর্যবেক্ষণকারী হতে পারে না। ত্রিশ বছর আগে এই ধরনের কথা খুব প্রচলিত ছিল ভূতাত্ত্বিকদের উচিত শুধু পর্যবেক্ষণ করা, কোনো তত্ত্ব গঠন করা নয়। এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে, কেউ একজন এ প্রসঙ্গে বলেছিল অনেকটা একরকম, একজন ব্যক্তি নুড়িপাথরের স্তূপ থেকে পাথর গুণতে লাগলো এবং তাদের রঙ বর্ণনা করতে লাগলো। এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার, সকল পর্যবেক্ষণের পক্ষে বিপক্ষে কিছু মত থাকতে পারে, যদি এটা আদৌ কোনো কাজ হয়ে থাকে!"

ডারউইনের পদ্ধতি আসলে একজন প্রকৃতিবিদের সময়ের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তারা প্রচুর বিষয়, ঘটনা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করেন, বুঝতে চেষ্টা করেন কিভাবে এবং কেন তাদের এই পর্যবেক্ষণ করছেন। যখন কোনো বিষয় নিয়ে একসাথে উপনীত হওয়া যায় না, তখন তারা অনুমান করতে চেষ্টা করেন, এবং অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণকে পরীক্ষণ করেন। হতে পারে পর্যবেক্ষণটি এর ফলে বাতিল হয়ে যাবে নয়তো মূল ধারণাকে

আরো শক্তিশালী করবে। এই প্রক্রিয়াটি আসলে পুরোপুরি ক্ল্যাসিকাল বিজ্ঞানের দর্শনের সাথে খাপ খায় না; কারণ এটা পরিচালিত হয় অনুকল্প অথবা মডেল গঠন, অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণের দ্বারা তাদের পরীক্ষণের মাধ্যমে। ডারউইনের ভাবনাটি বেশ ভালো এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রক্রিয়া ছিল। তার মতো প্রত্যেক আধুনিক বিজ্ঞানীই এখন অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে পরীক্ষণের জন্য পরিকল্পনার তৈরির নির্দেশ দেন। এবং এটা সত্যি ডারউইনের মতো এ্তো সফলভাবে আর কেউই এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেননি।

যে কোনো প্রশ্নের ঊর্ধ্বে রেখে বলা যায়, ডারউইন আসলেই প্রতিভাবান ছিলেন, যদিও তার অনেক কুৎসাকারী ছিলেন। এবং সেসময় আরো অনেক বুদ্ধিদীপ্ত জীববিজ্ঞানী ছিলেন যারা ডারউইনের মতো প্রাপ্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। ডারউইনের সাথে অন্যদের তফাৎটা কি ছিল? সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে, ডারউইন কি ধরনের বিজ্ঞানী ছিলেন সেটা অনুসন্ধান করলে। ডারউইন নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি একজন পুরোপুরি প্রকৃতিবিদ। তিনি একজন চমৎকার পর্যবেক্ষণকারী অন্যান্য প্রকৃতিবিদদের মত। জীবজগতের বৈচিত্র্য এবং অভিযোজন নিয়ে ডারউইনের খুব বেশি আগ্রহ ছিল। প্রকৃতিবিদরা সাধারণত বর্ণনাকারী, চিহ্নিতকারী হয়ে থাকেন, কিন্তু ডারউইন একই সাথে তত্ত্ব-গঠনকারীও ছিলেন। ডারউইনের সাথে অন্যান্য প্রকৃতিবিদের পার্থক্যটাও অন্য জায়গায়। তিনি শুধু পর্যবেক্ষণকারীই ছিলেন না, একই সাথে পরীক্ষকও ছিলেন। কোনো সমস্যা সমাধানে যখন প্রয়োজন পড়তো তখন পরীক্ষণ, গবেষণার মাধ্যমে সেই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন।

একটি মেধাবী মন, গভীর বুদ্ধিবৃত্তির দক্ষতা, একজন প্রকৃতিবিদের জন্য সবচেয়ে দরকারি বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, দার্শনিকভাবে তাত্ত্বিক, এবং গবেষক, এসকল বৈশিষ্ট্যের সমাহার গোটা বিশ্ব যতদূর মনে হয় একজন ব্যক্তির মধ্যেই দেখতে পেয়েছে, এবং তিনি হলেন চার্লস ডারউইন।

জীবাশ্ম:
নশ্বর দেহের কথা লেখা রয়েছে ভূত্বকে

ডারউইন যেমনটা বলেছেন 'The crust of the earth is a vast museum.' (১), পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের বিশাল এ যাদুঘরে স্তরে স্তরে লুকিয়ে রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি বছর ধরে জীবের অভিযাত্রার সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সত্য যে, জীবের এ অভিযাত্রার কাহিনি পরিপাটি করে সংরক্ষিত নেই কোথাও, বিক্ষিপ্ত-এলোমেলো অবস্থায় ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। অনেক জায়গায় ধ্বংসের আলামত, এমন কী ইতিহাসের বেশকিছু পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে চিরতরে পৃথিবীর ইতিহাসের বই থেকে।

প্রত্নজীববিদ্যায় জীবের দীর্ঘ অভিযাত্রার কথাই আলোচনা করে থাকে। জীবাশ্ম হলো পাথরে বা মাটিতে সংরক্ষিত উদ্ভিদ বা প্রাণীর 'অবশেষ'। জীবাশ্ম স্বয়ং দেহ হিসেবে সংরক্ষিত থাকতে পারে,ছাপ রেখে যেতে পারে পাথরের ওপর (এমন কী মাটিতেও), থাকতে পারে দেহ অনুকরণে, যাদের বলা হয়ে থাকে অনুকরণ জীবাশ্ম। বেশিরভাগ জীবদেহ মৃত্যুর পর তাড়াতাড়ি পঁচে যায়, অথবা জীবজন্তুর বর্জিতাংশ খেয়ে প্রাণ ধারণ করা প্রাণীরা মৃত জীবদেহ খেয়ে ফেলে। জীবাশ্ম গঠিত হতে দ্রুত সমাধি জরুরি। দেহের নরম অংশ যেমন মাংস,চামড়া,চোখ ইত্যাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু কঠিন অংশগুলো যেমন কংকালতন্ত্র,হাড়,দাঁত,খোলক ইত্যাদি দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকতে পারে এবং চারপাশে পলল খনিজ দ্বারা কঠিনায়িত হয়ে থাকে। দেহের কঠিন অংশগুলো মৃত্তিকায় মিশে গিয়ে রেখে যায় এক প্রকার ছাপ, যাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত

জীবদেহ গঠক মৃত্তিকা বলা হয়। এই মৃত্তিকা খনিজ দ্বারা পূর্ণ হয় এবং তার পাশে দেহাবয়বের একটি ছাঁচ তৈরি করে। জীবাশ্ম নিয়ে আলোচনাকারী প্রত্নজীববিদ্যা শুধুমাত্র জীবের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে না,পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস উদ্ঘাটন করতেও সহায়তা করে। আবার পাললিক শিলাময় অঞ্চলের সময়কাল নির্ণয়েও এই ফসিল গবেষণা সহায়তা করে। মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহের নরম অংশ খুব সহজেই বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং পরিণামে জীবদেহ জৈব এবং অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়। ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মাধ্যমে জীবদেহ অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ায় এই পদ্ধতিকে ইকোলজির ভাষায় 'বিয়োজন'(Decomposition) বলা হয়। শুধু জীবদেহের নরম অংশই নয়,এমন কী দেহের শক্ত অংশগুলো যেমন হাড় বা কংকালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মাটিতে মিশে যায়। হাড়ের ভিতরের মজ্জা,হাড়ের কোষগুলো অল্প সময়ের মধ্যেই বিয়োজিত হয়ে যায়। হাড়ের শক্ত অংশ সূর্য রশ্মির প্রভাবে, বৃষ্টিতে ভিজে, ভূমির সাথে ঘর্ষণে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এক সময় অজৈব পদার্থ হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়।

ফসিল রেকর্ড থেকে আমরা মোটামুটি তিনটি বিষয় জানতে পারি। প্রথমত, এখান থেকে বেশ ভালোভাবে জীববিবর্তনের ইতিহাস ফুটে ওঠে। ভূত্বকে প্রাপ্ত ফসিল থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি জীববিবর্তন তত্ত্বের সত্যাসত্য সম্পর্কে, যেমন: কোনো প্রজাতির সদস্যদের মধ্যেকার ধারাবাহিক পরিবর্তন,সদস্যদের মধ্যেকার বিভক্তি,নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে পূর্বপুরুষদের ক্রমবিকাশের চিহ্ন। দ্বিতীয়ত, অন্তর্বর্তী (transitional) প্রাণীদের যেখানে পাওয়ার কথা,সেখানেই পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, ডায়নোসর প্রজাতির প্রাণী থেকেই পাখির উদ্ভব। আদি পাখির জীবাশ্ম গবেষণা করে জানা গেছে এরা আধুনিক পাখি থেকে অনেক পুরাতন হলেও ডায়নোসর প্রজাতির পরেই এদের আবির্ভাব হয়েছিল। একই ঘটনা সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী জীব তিমির ক্ষেত্রেও। তিমি'র পূর্বপুরুষদের ফসিল অনুসন্ধান করে দেখা

গেছে, এ ফসিল আধুনিক তিমি থেকে বয়সে অনেক পুরাতন এবং Indohyus নামক এক ধরনের ছোট স্থলচর জীব থেকে সামুদ্রিক তিমির বিবর্তন ঘটেছে। জীববিবর্তন যদি সত্যি না হয়ে থাকে তবে জীবজগতে এ ক্রমবিকাশের চিহ্ন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস হ্যালডেনকে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জৈবিবর্তনকে কিভাবে ভুল প্রমাণ করা যায়। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'যদি প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শিলায় কোনো খরগোশের ফসিল পাওয়া যায়!' বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শিলায় এ ধরনের কোনো ফসিল (স্তন্যপায়ী প্রাণী) কখনো পাওয়া যায় নি। তৃতীয়ত, জীববিবর্তন একটি ক্রমবিকাশমূলক প্রক্রিয়া। কোনো ধরনের ধারাবাহিকতার চিহ্ন না রেখে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জীবের প্রজাতিতে বা কোনো পপুলেশনে সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হবে না। যেমন স্থলচর জীবের পা হুট করেই আসে নি, বরং তাদের পূর্বপুরুষ মাছের শক্ত বাহুর ভ্যারিয়েশন থেকে দীর্ঘ সময়ে উদ্ভূত হয়েছে। স্তন্যপায়ী জীবের কানের ছোট হাড়টি তাদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপের চোয়ালের হাড় থেকে ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা অনুসরণে উদ্ভূত। তেমনি পাখির ডানাও পূর্বপুরুষ ডায়নোসরের বাহু থেকে, তিমি'র সাঁতারের জন্য ব্যবহৃত প্যাডেল পূর্বপুরুষ স্থলচর জীবের সামনের বাহু থেকে বিবর্তনের ধারায় এসেছে। ডারউইন যখন প্রজাতির উদ্ভব অনুকল্পটি প্রদান করেছিলেন তখন ফসিল রেকর্ডে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। অনেক প্রাণীর ফসিল তখনও আবিষ্কার হয় নি, পূর্বপুরুষের সাথে অনেক প্রাণীর অন্তর্বর্তী গঠন সম্পর্কেও ডারউইন জানতেন না। তবু তার অনুকল্পে জানিয়েছিলেন, জীবের নতুন প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণ নতুন করে উদ্ভবিত না হয়ে বরং পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য থেকে পরিবর্তিত হয়েই এসেছে। আজকে ফসিল রেকর্ড ডারউইনের সেই পূর্বানুমানকেই 'সত্য' বলে প্রমাণ করেছে।

জীবাশ্ম কিভাবে গঠিত হয়? অনেকের বাসা-বাড়িতে মুখরোচক খাবার হিসেবে তেল-মসলা মিশিয়ে লেবুর আচার বানানো হয়। আবার আমরা ফ্রিজেও খাবার সংরক্ষণ

করে রাখি। শীতকালে দেখেছি গ্রীষ্মকালের তুলনায় খাবার কম নষ্ট হয়। জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাসে কাঁচের জারের ভিতর বিভিন্ন ধরনের তেল কিংবা ফরমালিন মিশিয়ে নানা প্রজাতির প্রাণী যেমন কেঁচো, কৃমি, তেলাপোকা, ব্যাঙ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ফ্রিজের এই ঠাণ্ডা পরিবেশ,তেল,ফরমালিন 'পচনরোধক' হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতিতেও এমনি পচনরোধক পরিবেশ এবং সংরক্ষক রয়েছে; যেমন মেরু অঞ্চল বা উঁচু পাহাড়ের চূড়ার বরফ,প্রাকৃতিক উপায়ে বেরিয়ে আসা ভূ-গর্ভস্থ তেল-আলকাতরা, কিংবা উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে নির্গত রজন জাতীয় পদার্থ 'Amber'। এমবারের ভেতর মাকড়শার জালের সূতাও ভালোভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ইউরোপের বাল্টিক তীর অঞ্চল থেকে এমবারের মধ্যে সংরক্ষিত প্রচুর জীবাশ্ম সংগৃহীত হয়েছে। সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে Picea succinifera প্রজাতির পাইন গাছ থেকে নির্গত এমবার থেকে।

যারা কক্সবাজার, মহেশখালীতে শুটকি মাছের আড়ৎ দেখেছেন, তারা জানেন মাছের দেহ থেকে রৌদ্রতাপে বা নির্দিষ্ট তাপ-প্রয়োগে পানি বের করে নিলে মাছ শুকিয়ে কিভাবে 'শুটকি' হয়ে যায়। শুটকি উপযুক্ত পরিবেশে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে। এমনিভাবে পানি শুকিয়ে যাওয়া কোন মৃত প্রাণীদেহও উপযুক্ত পরিবেশে প্রকৃতিতে হাজার-হাজার বছর অবিকৃত থাকতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো থেকে হংসচঞ্চু ডায়নোসর (Duck billed dinosaur) নামক এক প্রজাতির ডায়নোসরের শুকনো দেহ উদ্ধার হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পোটাগোনিয়াতে অবস্থিত Last hope নামক একটি গুহা থেকে বিলুপ্ত স্থলচর শ্লথের শুকনো চামড়া এবং হাড়ের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

জীবাশ্ম গঠনের সুবিধাজনক কোথায়? সমুদ্রে সৃষ্ট পাললিক শিলাস্তর বা সমুদ্রের তলদেশের পলির স্তর, আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার স্রোতে ঢেকে যাওয়া স্থান এবং পাহাড়ের গুহা জীবাশ্ম তৈরির সুবিধাজনক স্থান। তবে সাধারণভাবে নদীর মোহনা, মোহনার নিকটবর্তী সাগর জীবাশ্ম প্রাপ্তির আদর্শ স্থান, কারণ এসব স্থানে অধিক

হারে পলি জমা হয়; পলিগুলো যে উপাদান দ্বারা গঠিত সে উপাদানের নামানুসারে পাললিক শিলার নামকরণ করা হয়ে থাকে। নদী, হ্রদ, জলাভূমির তলদেশেও এমনিভাবে ঐ স্থানের জলচর প্রাণী বা উদ্ভিদ কাদার ভেতরে আবদ্ধ হয়ে বা বায়ুবাহিত ধুলোবালি দ্বারা আবৃত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হতে পারে। শুধু জলচর নয়, স্থলভাগের প্রাণী-উদ্ভিদ বৃষ্টির পানির স্রোতের সাথে নদী, হ্রদ বা জলাভূমির তলদেশে পড়তে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে এমন কতকগুলো স্থান রয়েছে যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবাশ্ম সংগ্রহ করা হয়েছে। এমন কয়েকটি স্থান হচ্ছে ভারতের উত্তরাংশে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত শিবালিক পাহাড় (Siwalik hills)। জম্মু, কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের উত্তরাংশের বিশাল এলাকা জুড়ে শিবালিক পাহাড়ের বিস্তৃতি। এই শিবালিক পাহাড় থেকে Camelus Sivalensis নামক উটের জীবাশ্ম, Stegodon ganesa নামক হাতির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তবে শিবালিক পাহাড় থেকে সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের পূর্বপুরুষদের জীবাশ্ম, Ramapithecus, Sugribpithecus, Sivapithecus, Brahmapithecus এবং Dryopithecus ।

পৃথিবীর ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি বিচরণ করলেও জীবাশ্ম সেই তুলনায় কম পাওয়া যায় কেন? উত্তরটি লুকিয়ে আছে প্রকৃতিতে জীবাশ্ম উদ্ভবের শর্তসমূহের মধ্যে। যে কোনো ধরনের জৈবজীবাশ্ম উদ্ভবের জন্য পিছনে কয়েকটি আবশ্যিক শর্ত রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে পাললিক শিলাতেই (Sedimentary Rocks) কেবল জীবাশ্ম পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি (পাললিক শিলাতে 'ফসিল' গঠিত হয় না)।(২) আগ্নেয়শিলা (Igneous Rocks) পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রচণ্ড উত্তপ্ত গলিত লাভা দিয়ে তৈরি,সেখানে ফসিল সংরক্ষণের কোনো সুযোগই নেই। রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks) হচ্ছে যে শিলা তাপ ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে যায়, ফলে সেখানেও ফসিল সংরক্ষণের তেমন সুযোগ নেই, তবে হঠাৎ হঠাৎ রূপান্তরিত

শিলাতে খুব সামান্য কিছু ফসিল পাওয়া যায়। তাছাড়া এখন পর্যন্ত ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা মহাদেশে সন্তোষজনকভাবে ফসিল অনুসন্ধানের জন্য জরিপ করা গেলেও কিন্তু বাকি মহাদেশগুলোতে খুব ধীর গতিতে এই গবেষণা কার্যক্রম চলছে; অর্থাৎ ফসিল অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর বিশাল অংশ এখনও বাকি রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রত্নজীববিজ্ঞানীদের ফসিল গবেষণা কার্যক্রমে আগ্রহ বোধ করে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্নজীববিজ্ঞানীদের আর্থিক বা কারিগরি কোনো ধরনের সহযোগিতা করা হয় না; এর একটা কারণ এখান থেকে আসলে তাৎক্ষণিকভাবে আর্থিক লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি চীন দেশে প্রত্নজীববিজ্ঞানের কার্যক্রম জোরেশোরে শুরু হয়েছে এবং বেশকিছু দুর্লভ প্রজাতির ফসিল উদ্ধার হয়েছে। অথচ কয়েক দশক আগেও চীনে ফসিল গবেষণা কার্যক্রম তেমন দেখা যেত না। আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বারেবারেই ফসিল গবেষণা বাঁধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, ফসিল গবেষণা একদিন বা দুই দিনের কাজ নয়, কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সীমিত পরিসরে করলেও সাফল্য আসার সম্ভাবনাও কম। এখন দেখা যাক, জীবাশ্ম গঠিত হওয়ার জন্য যে শর্তগুলি পূরণ করতে হয় তা হলো:

(ক) কোনো জীবের মৃত্যুর পর দেহখানি অবশ্যই অন্যান্য জীবের আক্রমণ থেকে মুক্ত হতে হবে। সাধারণভাবে মৃতজীবের দেহ ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা অন্যান্য জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পঁচে যায় কিংবা বিয়োজিত হয়। আবার অনেক সময় অন্য প্রাণী (ঈগল, শকুন, কাক, হায়েনা, বাঘ, সিংহ, শিয়াল, কুকুর, ইঁদুর, গুবরে পোকা ইত্যাদি) মৃতজীবদেহ সরাসরি খেয়ে ফেলতে পারে। সুতরাং যে জীবের জীবাশ্ম তৈরি হবে, তার মৃত্যু এমন স্থানে হবে যেখানে তার দেহ সহজে পঁচবে না বা অন্য কোনো জীব দ্বারা ভক্ষিত হবে না।

(খ) মৃতদেহ বা দেহের ছাপ স্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করে দীর্ঘদিন থাকতে হবে। ঢেউয়ের আঘাত, মাটি বা পাথর চাপা অবস্থা বা শিলাবৃষ্টির আঘাত থেকে উক্ত জীবদেহ বা দেহের ছাপ রক্ষা পেতে হবে।

(গ) মৃতদেহ বা দেহের ছাপ এমন স্থানে থাকতে হবে যেখানে অতিরিক্ত তাপ বা শৈত্য তা নষ্ট করবে না এবং সেখানে বাতাস বা পানির স্রোত এমন হবে না যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে প্রতিকূল অবস্থায় ফেলবে। সমুদ্রের তলদেশে চলে গেলে, কিংবা মাটির খুব গভীরে চলে গেলে সেখান থেকে ফসিল সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। সমুদ্রের তলদেশে প্রায়শই ভূকম্পের মাধ্যমে বিশাল পরিবর্তন ঘটে যায়। ফলে ফসিল আর সংরক্ষিত হয় না।(৩)

উপরোক্ত শর্ত বা ধাপ পেরনোর পর কোনো জীবের জীবাশ্ম রূপ লাভের সুযোগ থাকে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১.৮ মিলিয়ন প্রজাতির শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, ৪.৫ মিলিয়ন প্রজাতির নাম ও বর্ণনা প্রদান করা কখনো সম্ভব হবে না, কারণ তারা পৃথিবী থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উদ্ভিদের নরম অংশ (যেমন লতা-পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি), প্রাণীদেহের নরম অংশ যেমন মাংস পেশী, স্নায়ু, চোখ, ত্বক, পাকস্থলী ইত্যাদির জীবাশ্ম গঠন সহজে সম্ভব নয়। আবার যেসব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড নেই তাদের ক্ষেত্রেও জীবাশ্ম গঠন সহজে সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর অনেক সময় অন্য প্রাণী (ঈগল, শকুন, হায়েনা, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি), পোকামাকড়, কীট মৃতদেহকে প্রায়ই খেয়ে ফেলে নয়তো বিশেষ ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক দেহের নরম অংশগুলিকে সহজে ডিকম্পোজিশন করে, মৃতদেহ পঁচে অতঃপর মাটির সাথে মিশে যায়। ব্যাকটেরিয়াকে তো পৃথিবীর সবখানেই (সমুদ্রের তলদেশে, মাটির গভীরে, বাতাসে) পাওয়া যায়। জীবদেহের শক্ত অংশ অর্থাৎ হাড়, দাঁত, খোলস ইত্যাদি বৃষ্টিতে ভিজে, ভূমির সাথে ঘর্ষণে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষয় হয়,তাই অনেক সময় জীবদেহের এই শক্ত অংশের একটা সম্ভাবনা থাকে জীবাশ্মে পরিণত হওয়ার। তবে এই সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তাপ, ভূমির ক্ষয়, আগ্নেয়গিরির লাভা,

ভূমিকম্প, সমুদ্র বা নদীর তীব্র স্রোত, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী থেকে রক্ষার মধ্যে। পৃথিবীতে প্রথম দিককার জীবনের ইতিহাসের শতকরা ৮০ ভাগই ছিল নরম দেহের অমেরুদণ্ডী প্রাণী; ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, জলজ উদ্ভিদ, জেলি মাছ, ওয়ার্ম, কৃমি, কেঁচো, জোঁক জাতীয় প্রাণীর পূর্বসূরিরা। এই অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম গঠন অনেক অনেক বেশি আকস্মিক একটি বিষয়। এরপরও প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা বেশকিছু প্রাচীন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন প্রচণ্ড পরিশ্রম আর দীর্ঘমেয়াদি অধ্যাবসায়ের ফলে। পাশের ওয়েব সাইট থেকে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্মের কিছু ছবি দেখা যাবে: http://www.yale.edu/ypmip । আবার অনেক প্রজাতি আছে যারা সদস্যসংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই এ সকল অল্প সদস্যের প্রজাতির ফসিল গঠনের সুযোগও অনেক কম।

অতীতে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার মাত্রা ছিল অধিক; আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি যখনই হতো তখন বৃহৎ অংশ জুড়ে সবকিছু একেবারে ওলটপালট হয়ে যেত; ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্মও চিরতরে হারিয়ে যায়। জীবজগতের বিশাল ভাণ্ডার থেকে খুব কম সংখ্যক প্রাণীই এত ধ্বংসের সীমান্ত অতিক্রম করে টিকে গিয়েছিল আর বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে। প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বছর আগে সামুদ্রিক সব জীব বিশাল গণবিলুপ্তির শিকার হয়। তখন প্রায় ৯৫% প্রজাতিরই নির্বাপন ঘটে। গণবলিুপ্তি তাকেই বলা হয়, যখন আবহাওয়া-পরিবেশগত বদলের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় খুব দ্রুত গতিতে ব্যাপক সংখ্যক প্রজাতি লোপ পেতে শুরু করে। ভূতত্ত্ববিদ্যার হিসেবে পৃথিবীর সাড়ে চারশো কোটি বছরের ইতিহাসে ২৩ টির মত গণবিলুপ্তির ঘটনা ঘটলেও ভূতত্ত্ববিদরা পাঁচটি খুব বড় ধরনের গণবিলুপ্তির ঘটনা খুব ভালোভাবেই চিহ্নিত করতে পেরেছেন।□(৪) এ গণবিলুপ্তির কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলেছেন সমুদ্রের পানির উচ্চতাবৃদ্ধি, পানিতে লবনাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির মিশ্রণ, সমুদ্রের অভ্যন্তরে

ভূত্বকের পরিবর্তন, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে সমুদ্রে বসবাসরত জীবের প্রতিবেশ (ecology) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবর্তিত প্রতিবেশে কিছু সংখ্যক উদ্ভিদ-প্রাণী কোনো রকমে টিকে গেলেও সামুদ্রিক জীবের এক বড় অংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত শত মিলিয়ন বছরে বহুবারই সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়েছে-কমেছে, জীবের জীবন ধারণের উপযুক্ত প্রতিবেশের বদল হয়েছে আবহাওয়ার পরিবর্তন, টেকটোনিক প্লেটগুলোর মধ্যেকার গতিশীলতা, মহাদেশীয় সঞ্চরণ ইত্যাদি কারণে। আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে মধ্য উত্তর আমেরিকার এক বিশাল অংশ সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে অগভীরভাবেই তলিয়ে যায়। এ অগভীর এলাকায় আটকা পড়ে হাঙ্গরের পূর্বপুরুষসহ বৃহৎ সামুদ্রিক জীব। পরবর্তীতে যখন সমুদ্রের পানি উপকূলীয় অঞ্চল ছেড়ে নেমে আসে, তখন আটকা পড়া হাঙ্গরের পূর্বপুরুষ, mosasaurs -এর মত বৃহৎ সামুদ্রিক জীবেরা প্রচুর পরিমাণে মারা যায়।

এতো গেলো সামুদ্রিক জীবের গণবিলুপ্তির কারণ কিন্তু স্থলভাগে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আরো কিছু কারণ রয়েছে। দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, উল্কাপিণ্ডের পতন, রোগ-জীবাণুর আক্রমণে স্থলভাগে জীবের গণবিলুপ্তি ঘটেছে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে। ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে ডায়নোসর প্রজাতির বিশাল অংশসহ ঐ সময়ের জীবজগতের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ উদ্ভিদ, এবং শতকরা ৭৫ ভাগ প্রাণীর বিলুপ্তির কারণ হিসেবে পৃথিবীতে বিপুল পরিমাণ উল্কাপিণ্ডের পতনকেই দায়ী করেন বিজ্ঞানীরা। মনে রাখতে হবে, বিশাল আকৃতির বিপুল পরিমাণ উল্কাপিণ্ডের পতনে দ্রুতগতিতে জীবের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে কিন্তু সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি খুব ধীর লয়ে ঘটে থাকে। ফলে একজন ব্যক্তির পক্ষে তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। তবে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে জীবের গণবিলুপ্তির জন্য সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি একটি জোরালো 'ফোর্স' হিসেবেই কাজ করেছে। সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর প্রায় ৭০ ভাগ অঞ্চল সমুদ্র দ্বারা আবৃত এবং বিশাল এই সামুদ্রিক অঞ্চলে কম করে হলে বর্তমানে প্রায় ২

মিলিয়ন প্রজাতির জীব বসবাস করে। প্রতি বছরই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন ১৫০-২০০ প্রজাতির মাছ, ১৭০০ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ চিহ্নিত করছেন। বেশিরভাগই ওয়ার্ম এবং জেলি মাছ ধরনের প্রাণী। বর্তমানে (ধনীদেশগুলোর অধিক মুনাফার লোভ আর বিলাসবহুল পণ্যের বিপুল ব্যবহারের কারণে কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ পরিবেশে মিশ্রণের ফলে) বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পৃথিবীর মেরু-অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের পানির উচ্চতা দিনে দিনে বেড়ে চলছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে, উপকূলীয় অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন সামুদ্রিক জীব (তিমি, হাঙ্গর, সীল, সি-লায়ন, স্যামন মাছ, টুনা মাছ, ডলফিন, মেরু ভল্লুক, শুশুক, অ্যালবাট্রোস পাখি প্রভৃতি সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়), জীবের প্রতিবেশ-আবাসভূমিও দিনদিন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে চলছে। এছাড়া প্রতি বছর আমাদের নির্বিচারে অতিরিক্ত মৎস শিকার এবং বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক জীব হত্যা অনেকাংশে দায়ী। প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিকতায় অপরিণামদর্শী হস্তক্ষেপ করে চলছি আমরা প্রতিনিয়ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডোডো পাখির কথা। একসময় মরিশাস দ্বীপপুঞ্জে এ পাখি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। পাখিটি উড়তে পারতো না। ইউরোপের নাবিকরা যখন এ দ্বীপে আসে, এ পাখির মাংস সুস্বাদু হওয়ায় নাবিকেরা নির্বিচারে নিধন শুরু করে। সতের শতাব্দীর শেষভাগেই সবগুলি ডোডো পাখি নিহত হয়। আজ আর কোথাও এ পাখির অস্তিত্ব নেই। তবে আজও ইংরেজি একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে “Dead as the Dodo”-যেখানে মানুষ নিজেদের হিংস্রতা আর নির্বুদ্ধিতা অহংকারের সহিত প্রকাশ করে। মানুষের কারণেই আজ প্রকৃতির স্বাভাবিক খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়ার উপক্রম। উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা না গেলে আমরা হয়তো আরেকটি গণবিলুপ্তির সাক্ষী হতে চলছি, (যার কারণ আমরা নিজেই)। জীববিজ্ঞানীরা যাকে বলছেন,‘ষষ্ঠ গণবিলুপ্তি’। বলার অপেক্ষা রাখে না, অভিজ্ঞতাটি আমাদের জন্য মোটেই সুখকর হবে না।

প্রত্নজীববিজ্ঞানীদের কাছে ফসিল রেকর্ড এখনও অসম্পূর্ণ, তাহলে এ থেকে কিভাবে জীববিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। এটা সত্য যে ফসিল রেকর্ড এখনও অসম্পূর্ণ, তাই বলে কতটুকু? জীববিবর্তনের পক্ষে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য সংগৃহীত হয়েছে ফসিলবিদ্যা বা প্রত্নজীববিদ্যা থেকে। সারা বিশ্বের প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা শারীরসংস্থান পরীক্ষা, ডিএনএ টেস্ট, রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জীবাশ্ম-প্রজাতি উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন,যার মধ্য থেকে এমন একটি ফসিলও পাওয়া যায় নি, যা জীববিবর্তনের 'জীবন-বৃক্ষের' (tree of life) বিরোধী কিংবা ভূতাত্ত্বিক সময়কালের সাথে খাপ খায় না। ইতিমধ্যে ফসিল গবেষণা করে হাতি, ঘোড়া, উটের বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে; স্তন্যপায়ী জীবসহ, সরীসৃপ থেকে পাখির বিবর্তনের একটি সামগ্রিক চিত্র ফসিল রেকর্ড থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের পূর্বপুরুষের ইতিহাস সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করা গেছে। যদিও সকল প্রজাতির জীবের সাথে তুলনা করলে উদ্ঘাটিত এ জীবাশ্মের সাক্ষ্যপ্রমাণ মাত্র ০.১ থেকে ১% পর্যন্ত। কিন্তু সংখ্যা দিয়ে হিসেব করে নয়, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফসিল রেকর্ড (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জীবাশ্ম-প্রজাতি) থেকে খুব ভালভাবেই জীবের ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, আমাদের সামনে সহজেই বোধগম্য করছে প্রজাতিতে পরিবর্তনের ধারা, নতুন প্রজাতির উদ্ভব, একটি ট্যাক্সা থেকে আরেক ট্যাক্সার উৎপত্তি প্রক্রিয়াটি -সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয় 'ম্যাক্রো-বিবর্তন'।

বহু দিনের পুরানো ছোট এক টুকরো হাড় বা ভাঙা দাতের টুকরো কিংবা মাথার খুলির একটি অর্ধেক অংশ থেকে কি কোনো প্রজাতি সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? কিংবা এই প্রাণীর শারীরিক গঠনের নিশ্চিৎ ছবি আঁকা যায়? জীবাশ্ম সংগ্রহ, গবেষণা কার্যক্রম 'অবসর বেলায় পুকুর পাড়ে বসে বড়শি পাতা, আর মাছ ধরা'র মত বিষয়টি এতো সহজ বা সাদামাটা নয়। বিজ্ঞানীদের নিরন্তর নিষ্ঠা, প্রচণ্ড পরিশ্রম, আর অধ্যাবসায়ের সমন্বয়ে একেকটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।(৫) ফসিল-

বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রাণীর নমুনা বা পুর্নাবয়ব অঙ্কন করেন নি, যার ফসিল তারা একদমই খুঁজে পাননি। প্রত্নজীববিদ্যার জার্নাল বা বইয়ে যেসব ফসিলের যেসব ছবি দেখানো হয়, সেসব ফসিলের অবশ্যই কোনো না কোন নমুনা বা পূর্ণাঙ্গ দেহ আবিষ্কৃত হয়েছে,যার মাধ্যমে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেই ফসিলের পূর্বের দৈহিক গঠনের চিত্র অঙ্কন করা হয়। যদি এমন হয় যে, প্রাপ্ত ছোট্ট এক টুকরো ফসিল (হাড় কিংবা দাঁতের টুকরো অথবা গায়ের লোম হতে পারে) নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পরও সে প্রাণীটির পূর্ণ অবয়ব অঙ্কন করা সম্ভব হয় না,তাহলে সে প্রাণীটির কোন ছবি তৈরি করা হয় না, শুধু ফসিলের নমুনা অঙ্কন করে (হতে পারে শুধু হাড়ের টুকরো বা দাঁতের ছবি) এবং তার সঙ্গে গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

কোনো কোনো ক্রিয়েশনিস্ট জীববিবর্তনের বিরোধিতা করে বলে থাকেন, ‘জীবাশ্ম পাওয়া মাত্রই বিজ্ঞানীরা তার ছবি একে ফেলেন আর জীববিবর্তন তত্ত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন’। এরকমটা যারা বলেন তারা হয় ইচ্ছেকৃতভাবে সত্যকে গোপন করেন, নয়তো জীবাশ্ম সংগ্রহ-গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের কোনো সম্যক ধারণা নেই। প্রত্নজীববিদ্যা একটি ইতিহাস আশ্রয়ী বিজ্ঞান যেমনটা ভূতত্ত্ববিদ্যা কিংবা জ্যোতির্জীববিজ্ঞান। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের মতো প্রত্নজীববিদ্যায় সবসময় গবেষণাগারে বসে পরীক্ষণ কার্যক্রম চালানো হয় না, বরং তাদের মাঠপর্যায়ে কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখার মতই এখানে (প্রত্নজীববিদ্যায়) কঠোর বৈজ্ঞানিক মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কোন একটি জীবাশ্ম সংগ্রহ, গবেষণা, বর্ণনা, প্রদর্শন এবং প্রকাশনা ইত্যাদি ধাপ অতিক্রম হওয়ার পরই কেবল একটি জীবাশ্ম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত জীবের শুধুমাত্র দেহের একটি-দুটি হাঁড়, দাঁত, দেহের ছাপ কিংবা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল বা পাতা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকারী অভিজ্ঞ প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা একমত হওয়ার

ভিত্তিতেই কেবল সম্পূর্ণ প্রাণী বা উদ্ভিদের আকৃতি অঙ্কন করা হয়ে থাকে। তাও আকৃতি অঙ্কনের পর পাশে অবশ্যই লিখে দেওয়া হয় চিত্রটি 'কাল্পনিক'।

ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের পর যদি হঠাৎ করেই আধুনিক জীবের উদ্ভব ঘটে থাকে, তবে তা তো জীববিবর্তনের 'ধীরে চলো' নীতিকে বিরোধিতা করে। যুক্তরাজ্যের ওয়েলস (wales) নামক স্থানকে প্রাচীনকালে রোমানরা 'ক্যাম্ব্রিয়া' নামে ডাকতো। অতীতে এ পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে (কম-বেশি ৫০৫-৫৪৪ মিলিয়ন বছরের মধ্যে) শিলাস্তর সৃষ্টি হয়েছিল সে ধরনের শিলা ফসিলবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিকরা প্রথম ওয়েলস থেকে সংগ্রহ করেন। তাই এর নাম রাখা হয় 'ক্যাম্ব্রিয়ান'। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী এ পিরিয়ডে পৃথিবীর সমুদ্রে সমতলের (Sea Level) উচ্চতা থেকে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেশি ছিল ফলে অনেক নীচু স্থলভাগ নিমজ্জিত ছিল এবং পৃথিবীর মোট স্থলভাগের পরিমাণ কম ছিল। এ যুগে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীজগতের বিভিন্ন পর্বের (Phyla) এবং শ্রেণীর (Class) বিবর্তন ঘটেছিল; এ পিরিয়ডে লোফোফেরেট (Lophorate) জাতীয় কর্ষিকাবাহী অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আধিক্য ছিল এবং একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) পর্বের প্রাণীর আগমন ঘটেছিল। এনেলিডা (Annelida) ও অর্থোপোডা (Arthopoda) পর্ব দুটি এ পিরিয়ডে প্রোটোস্টোম (Protostome) জাতীয় প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। কর্ডাটা (Chordata) পর্বের নিম্ন ধাপের প্রাণীগুলো তখনও বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভূত হওয়ার পথে। প্রথম আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণী, শেলযুক্ত বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী (যেমন Anomalocarids) ও শৈবালের বিকাশ ঘটেছিল এ সময়ে। ক্যাম্ব্রিয়ান শিলাখণ্ডে প্রাপ্ত ফসিলে প্রাণীজগতে বিভাজনের (পর্ব, শ্রেণী, গোত্র) আধিক্য দেখা যাওয়ায় অনেকে এ পিরিয়ডকে 'ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ' নামে অভিহিত করে থাকেন। যদিও এ সময় পোকামাকড়, সরীসৃপ, পাখি, পাইন গাছ কিংবা ফুলেল বৃক্ষ ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটেছিল এ সময়ে। ফলে পরবর্তী শত মিলিয়ন বছরের ক্রমবিকাশের পরিক্রমায় পৃথিবীতে প্রাণবৈচিত্র্যের

উন্মেষ। প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে জীবের বিকাশের হার ছিল ধীর, এককোষী থেকে বহুকোষী জীবের আবির্ভাব হলেও ঐ সময় জীবন ছিল তুলনামূলক সরল, জীবেরা ছিল তুলনামূলক নরম দেহের অধিকারী। কিন্তু সবুজ শৈবাল দ্বারা সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে বহুল পরিমাণে মুক্ত অক্সিজেন জমা হতে থাকে। ফলে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে এসে জীবের ক্রমবিকাশের হারও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাণীজগতে যে বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণীর বিভাজন দেখা যায়, তা ক্যাম্ব্রিয়ান সময়কালে বিবর্তিত হয়েছে। অনেক জীববিবর্তন-তাত্ত্বিক বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণীর এ বিভাজনকে 'আকস্মিক' বলে অভিহিত করেছেন। আকস্মিক বলা হয়েছে এই কারণে যে ক্যাম্ব্রিয়ান সময়কালের শিলায় প্রাপ্ত ফসিলে প্রাণীজগতে বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণীর অনেক বিভাজন দেখা যায়। 'আকস্মিক' বলা হয় নি এ কারণে যে, এ বিভাজন বা প্রাণীগুলো 'তাৎক্ষণিকভাবে' উদ্ভূত হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিকদের হিসেবে আজ থেকে প্রায় অর্ধবিলিয়ন বছর আগে ক্যাম্ব্রিয়ান সময়কাল কমপক্ষে ২০ থেকে ৪০ মিলিয়ন বছর স্থায়ী ছিল। এই ২০-৪০ মিলিয়ন সময়কালের প্রাণীজগতের বিভিন্ন পর্ব ও শ্রেণীর বিভাজন ঘটেছে বলে জীববিবর্তন-তাত্ত্বিকরা মনে করেন। বিবর্তনীয় বিকাশমূলক জীববিজ্ঞান (Evolutionary Developmental Biology)-এর আধুনিক গবেষণা হতে জানা যায়, বড়, মেরুদণ্ডী, কিছুটা জটিল প্রাণীদেহ গঠনের জন্য দায়ী জিনগুলো ঐ প্রাণীদেহ আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ জটিল দেহ গঠনের জিনগুলি ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পূর্বের সরল-নরম দেহের অধিকারী প্রাণীদের মধ্যে ছিল; কিন্তু জিনগুলি কার্যকর হওয়ার মত উপযুক্ত বাস্তুগত পরিবেশ ছিল না। ফলে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পূর্বে জটিল দেহের অধিকারী জীবের উৎপত্তি হয় নি। পূর্ব থেকে বিদ্যমান দেহ গঠনের জিনগুলির বহুমাত্রিক ব্যবহারের ফলে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের উপযুক্ত পরিবেশে জটিল প্রাণীদের উদ্ভব ঘটে। (দ্রষ্টব্য: Sean B. Carroll, Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom, W. W. Norton & Company, 2005)। ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণের সময়কালে উদ্ভূত প্রাণীর 'ancestral

fossils' নেই বা পাওয়া যায় নি।' এ ধরনের দাবি সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের পূর্বে জেলি মাছ ও স্পঞ্জের মত অমেরুদণ্ডী প্রাণী দেখা যেত কিন্তু পোকামাকড়, ট্রাইলাবাইটদের মত দ্বিপার্শ্বীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না।(৬)

উপরের এই আলোচনা হতে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ কোনোভাবেই জীববিবর্তন নীতিকে বিরোধিতা করে নি।

জীববিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক জীবের কমপক্ষে দুটি প্রজাতির (দুটি প্রজাতির মধ্যে যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন) পূর্বে একটি প্রজাতি ছিল, যারা উক্ত দুটি প্রজাতির পূর্বপুরুষ। অনেকে এই পূর্বপুরুষ প্রজাতিকে রূপক অর্থে missing link বা হারানো সূত্র বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু এটি কোনো বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নয়। টেকনিক্যালি 'মিসিং লিংক' শব্দ দ্বারা এমন কিছু জীবাশ্মকে বুঝিয়ে থাকে, যাদের মধ্যে আছে দুটি ফাইলা (পর্ব) বা অন্যান্য ট্যাক্সার অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্যসমূহ। এই অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে এ ধরনের জীবাশ্মকে একটি ট্যাক্সা থেকে অন্য ট্যাক্সার উৎপত্তির প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানকালের অনেক জীববিজ্ঞানী-প্রত্নজীববিজ্ঞানী 'মিসিং লিংক' শব্দটি ব্যবহার করতে রাজি নন। তাদের মতে এতে জীববিবর্তন সম্পর্কে একটি ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং এরিস্টোটলের সেই জীবনের গ্রেট চেইন-এর ধারণাকেই (জীবনের অপরিবর্তনীয়তার ধারণা) প্রকাশ করে। এই মিসিং লিংকের বর্ণনা থেকে 'অখণ্ড চেইন'-এর ধারণা প্রকাশ পায়, যেমন সরীসৃপ জাতীয় চারপাওয়ালা জীব থেকে স্তন্যপায়ী দুইপাওয়ালা জীবের উদ্ভব। কিন্তু এখনকার দুইপাওয়ালা জীবের পূর্বে আরো অনেক দুইপাওয়ালা জীবের অস্তিত্ব ছিল। এরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু চারপাওয়ালা জীব বর্তমানে টিকে রয়েছে। অর্থাৎ মিসিং লিংক জীবের সাথে জীবের অখণ্ড সম্পর্ক বুঝাতে গিয়ে এখান থেকে জীবের বিলুপ্তি বা জীবের বিবর্তনের আঁকাবাঁকা পথটি প্রকাশ পায় না। আর জীববিবর্তন তো সিড়ির মতো ধাপে ধাপে সরলরেখায় কখনো ঘটে না। 'মিসিং লিংক শব্দটি দ্বারা মনে হয় যেন প্রত্যেকটি লিংক বা শেকল একেকটি প্রজাতিকে নির্দেশ করে; একেকটি

জীবনের বৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্কিত। মনে হয় যেন প্রতিটি লিংক আরো দুটি লিংকের সাথে সংযুক্ত; একটা ইঙ্গিত করে অতীতের, আরেকটি ভবিষ্যতের। কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনো প্রজাতিই স্থির নয়। এটা নিশ্চিৎ করে বলা কঠিন ঠিক কোথায়-কখন এসে একটি প্রজাতির শেষ হবে এবং অন্য প্রজাতির উদ্ভব হবে।'(৭) এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে কিছু বলা অসম্ভব। প্রকৃতিতে জীববিবর্তন নির্ভর করে কোনো প্রজাতি বা কোনো পপুলেশনে (মিউটেশনের মাধ্যমে) বহুমুখী ভ্যারিয়েশন, পরিবর্তিত পরিবেশ, অভিযোজন আর দীর্ঘ সময়ের উপর।

১৮৫১ সালে ডারউইনের ঘনিষ্ট বন্ধু ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল সংগৃহীত কয়েকটি ফসিল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে সর্বপ্রথম 'মিসিং লিংক' শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে শব্দটি নানা কারণে জনপ্রিয় হয়ে যায়। যদিও আট বছর পরে প্রকাশিত অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থে ডারউইন নিজে 'মিসিং লিংক' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তিনি এর পরিবর্তে 'পরিবর্তনশীল গঠন' (transitional forms) শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থের 'তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা' অধ্যায়ে খোলামেলাভাবেই স্বীকার করেছেন পরিবর্তনশীল গঠনসম্পন্ন জীবের সীমিত উপস্থিতি নিয়ে।

বিবর্তন-বিরোধীরা ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল বা অন্তর্বর্তী বা মধ্যবর্তী জীবাশ্ম বা 'পরিবর্তশীল জীবাশ্ম' নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেন, যেমন কোনো জীবের পূর্বপুরুষদের ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল পাওয়া যায় নি; বা ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল এত কম পাওয়া যায় কেন? এমন কোনো প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায় নি, যেখানে অর্ধবিকশিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ফসিল কেন এত কম আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তর আগেই দেয়া হয়েছে। তাই ট্রাঞ্জিশনাল ফসিলের অস্তিত্ব কম কেন, তা আর পুনরুল্লেখ করা হল না। কোন প্রজাতির কয়টি ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল পাওয়া গেল, তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাওয়া একটি ফসিলও কি জীববিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করছে কি? সরাসরি

উত্তর হচ্ছে না। জীববিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক প্রজাতিই ট্রাঞ্জিশনাল বা পরিবর্তনশীল এবং জীববিজ্ঞানীরা জীবের বিবর্তনের যে ধারা আবিষ্কার করেছেন তা হচ্ছে: মাছ->উভচর->সরীসৃপ->স্তন্যপায়ী প্রাণী। জীবজগতের প্রজাতিতে এ পরিবর্তনগুলো বা নতুন প্রজাতির উদ্ভব এতো ধীর লয়ে ঘটে যে একজন ব্যক্তির জীবনকালে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। প্রত্নজীববিজ্ঞানীদের কাছে ফসিল শুধু মৃতজীবের শুধুমাত্র একটুকরো অবশেষই নয়, বরং নতুন প্রজাতি কিভাবে প্রাচীন পূর্বপুরুষ হতে উদ্বর্তিত হয়েছে, মৃতজীবের জীবনধারা, প্রতিবেশ, দৈহিক গঠন-বিকাশ-এ সবই ফটে ওঠে ফসিলের আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে। যখন ক্রিয়েশনস্টিরা বলে থাকেন কোনো জীবের পূর্বপুরুষদের ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল পাওয়া যায় নি-তখন সমস্যা দেখা যায় তারা কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকলে ঐ জীবাশ্মকে 'ট্রাঞ্জিশনাল' বলবেন? প্রথম উভচর জীবের উদ্ভব আজ থেকে প্রায় ৩৮০ মিলিয়ন বছর আগে,ডেভোনিয়ান পিরিয়ডে। জল ও স্থলে বাস করতে সক্ষম ঐ জীবদের বস্তুত 'উভচর' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু অবশ্যই আধুনিক (আজকের যুগের) উভচরদের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল। পার্থক্য শুধু চেহারার গঠনে নয়,দেহের অভ্যন্তরীণ গঠনেও কিছুটা। আমরা জানি মাছের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: মাছের শরীরে কংকালতন্ত্র আছে, মাছ শীতল রক্তের প্রাণী, ফুলকা দ্বারা শ্বাসক্রিয়া চালায়। সন্তান সরাসরি প্রসব না করে মাছ ডিম পাড়ে। মাছের শরীরে আঁশ এবং পাখনা রয়েছে। আধুনিক উভচর প্রাণীর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এদের কংকালতন্ত্র রয়েছে। এরা শীতল রক্তের প্রাণী। জন্মের পর এরা প্রথম দিকে ফুলকা দ্বারা শ্বাসক্রিয়া চালালেও ধীরে ধীরে ফুলকার রূপান্তর ঘটে এবং বয়স বৃদ্ধি হলে ফুসফুস দ্বারা শ্বাসক্রিয়া চালায় উভচর প্রাণীও পানিতে ডিম পাড়ে। এদের ত্বক আর্দ্র এবং মসৃণ। পাখনার বদলে হাঁটার জন্য এদের পা রয়েছে।(৮) কিন্তু ডেভোনিয়ান পিরিয়ডের উভচর প্রাণীর পূর্বপুরুষের ফসিল (যেমন ২০০৬ সালে আবিষ্কৃত Tiktaalik roseae) থেকে দেখা গেছে এদের দেহে মাছের মত শ্বাসক্রিয়ার জন্য ফুলকা রয়েছে, শরীরের নিচের দিকে আঁশের অস্তিত্ব রয়েছে। সম্পূর্ণ পাখনার বদলে

এদের বাহুর মধ্যবর্তী গঠন (lepidotrichia) দৃশ্যমান। যদিও মাছের মত দুই পাশে চোখের অবস্থান নয়, কিছুটা কুমিরের মত উপরের দিকে চোখের অবস্থান। সবমিলিয়ে প্রত্নজীববিজ্ঞানীদের মত হচ্ছে, প্রথমদিককার এ উভচরের (টিকটালিক) চেহারা ও দৈহিক গঠন বর্তমানকালের আধুনিক উভচরের চেয়ে মাছের গঠনের সাথেই মিল বেশি; অর্থাৎ যতই অতীতের দিকে যাওয়া হবে, ততই এরকম মিল বেশি করে পাওয়া যাবে এবং যতই বর্তমানকালের দিকে আসা হবে, পার্থক্য ততই প্রকট হবে। স্মর্তব্য যে জীববিবর্তন তত্ত্ব বলে পৃথিবীতে রাতারাতি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রাণী 'উভচর'-এর উদ্ভব ঘটে নি, বরং জলজ জীব মাছের মধ্যে থেকে একটু একটু করে ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দীর্ঘ সময়ে ক্রমবিকশিত হয়ে উভচর প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে। এ ঘটনা শুধু মাছের সাথে প্রাচীনকালের উভচরের মিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পৃথিবীতে জীবনের ইতিহাসের প্রত্যেকটি স্তরে এরকমটি দেখা যায়। একদম প্রথমদিককার সরীসৃপের শারীরিক গঠন ও চেহারা অসামান্যভাবে উভচররূপী, প্রথমদিককার স্তন্যপায়ী জীবের দৈহিক গঠনও সরীসৃপসদৃশ। পাখির পূর্বপুরুষও ডায়নোসরসদৃশ। জীবনের এ ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে কোনো প্রজাতিই হুট করে এ পৃথিবীতে আসে নি,কারো নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় সৃষ্টি হয় নি, বরং নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে পুরানো প্রজাতি থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে।

'ট্রাঞ্জিশনাল ফসিল' বলতে যদি বুঝিয়ে থাকে এমন কিছু জীবাশ্ম যাদের মধ্যে আছে দুটি ফাইলা (পর্ব) বা অন্যান্য ট্যাক্সার অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্যসমূহ', তাহলে এরকম প্রচুর জীবাশ্ম ইতিমধ্যে প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। যেমন অর্কিঅপটেরিক্স (Archaeopteryx)-অর্ধেক সরীসৃপ, অর্ধেক পাখি। ১৮৬০ সালে জার্মানির সলেনহোফেন অঞ্চলের চুনাপাথরের খনিতে সর্বপ্রথম অর্কিঅপটেরিক্সের একটি পালক 'জীবাশ্ম' হিসেবে পাওয়া যায়। জীবাশ্ম বয়স ডেটিং করে জানা যায় এটি প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বছরের পুরাতন, ভূতাত্ত্বিক হিসেবে জুরাসিক যুগের একেবারে

শেষের দিককার। কিন্তু শুধুমাত্র একটি পালকের গুরুত্ব বা মর্মার্থ তখন কেউ বুঝে উঠতে পারে নি। পরের বছর ১৮৬১ সালে জার্মানির ল্যাংগেনালথিম থেকে পাওয়া অর্কিঅপটেরিক্সের (Archaeopteryx lithographica) একটি পূর্ণাঙ্গ ফসিল (সংক্ষেপে নাম দেয়া হয় 'লন্ডন নমুনা' বা London Specimen) নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা নড়ে চড়ে বসেন। ডারউইনের সুহৃদ টমাস হাক্সলি এ ফসিলকে গবেষণা করে পাখি ও ডায়নোসরের 'অন্তর্বর্তী ফসিল' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ফসিলটির চমকপ্রদ কতিপয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আধুনিক পাখির মত পালক, ডানা, পায়ের আঙ্গুলগুলিতে নখর, কণ্ঠাস্থি (wishbone ev furcula) দুর্লভভাবেই অক্ষত ছিল। পালক দেখে ধারণা করা যায়, এরা সামান্য দূরত্ব উড়তে পারতো। পাশাপাশি এ ফসিলে সরীসৃপ জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন (মাংসাশী) ছোট আকারের থেরাপড ডায়নোসরের মত কংকাল, বক্ষপিঞ্জর, শ্রোণীচক্র, লম্বা সরু হাড়যুক্ত লেজ, চোয়ালে তীক্ষ্ণ দাঁতের অস্তিত্ব। আধুনিক পাখির চোয়ালে কোনো দাঁত নেই এবং পালক দ্বারা গঠিত লেজ থাকলেও তাদের লেজের জন্য কোনো হাড় নেই। তাই অর্কিঅপটেরিক্সের একই সাথে সরীসৃপ এবং আধুনিক পাখির উভয় ধরনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও সরীসৃপ অর্থাৎ ছোট আকারের থেরাপড ডায়নোসরের সাথে একে বেশি ঘনিষ্ট বলে প্রত্নজীববিজ্ঞানীরা মনে করে। এরপর বিভিন্ন সময় যেমন ১৮৭৭ সালে জার্মানির ব্লুমেনবার্গে লন্ডন স্পেসিমেনের তুলনায় বেশ ভালো অর্কিঅপটেরিক্সের ফসিল (পূর্ণাঙ্গ মস্তকসহ) পাওয়া যায় (সংক্ষেপে বার্লিন স্পেসিমেন),১৯৫৮ সালে ল্যাংগেনালথিমে ম্যাক্সবার্গ স্পেসিমেন, ১৮৫৫ সালে রিডিনবার্গে হারলিম বা টেইলার স্পেসিমেন পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালে হারলিম বা টেইলার স্পেসিমেন পাওয়া গেলেও দীর্ঘদিন এ ফসিলের মর্মার্থ কেউ বুঝতে পারেন নি। ১৯৭০ পুনরায় এটি পরীক্ষার পর অর্কিঅপটেরিক্সের ফসিল বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৫১ সালে ওয়ার্কারজেলে অর্কিঅপটেরিক্সের মধ্যে সবচেয়ে ছোট স্পেসিমেন (ইচ্সিট্যাট) পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে সলেনহোফেন স্পেসিমেন, ১৯৯১ সালে মিউনিখ স্পেসিমেন নিয়ে ইতিমধ্যে অর্কিঅপটেরিক্সের ৭টি স্পেসিমেন এবং একটি

পালক উদ্ধার হয়েছে।(৯) উল্লেখ্য, আধুনিক পাখিদের ক্ষেত্রে ‘পালক’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমানকালে পাখি ব্যতীত আর কোনো প্রাণীতে পালক দেখা যায় না।

চিত্র: অর্কিঅপটেরিক্সের ফসিল

ডায়নোসরের ফসিল থেকে জানা গেছে প্রায় ৭০০ প্রজাতির ডায়নোসর দুটি বর্গে (Order) বিভক্ত ছিল, যথা Ornithischia এবং Saurischia। বর্গ দুটির বিভাজন করা হয়েছে ‘কটিদেশের গঠন’ (hip structure)-এর উপর নির্ভর করে। Saurischia বর্গটি দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা চার পা বিশিষ্ট তৃণভোজী sauropodomorpha এবং দুই পা বিশিষ্ট মাংসাশী ছোট আকারের থেরাপড ডায়নোসর।

জীববিজ্ঞানীরা দাবি করেন না যে, ডায়নোসরের দুটো বর্গের সবগুলো প্রজাতি থেকেই পাখির উদ্ভব ঘটেছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে শুধুমাত্র Saurischia বর্গের ছোট আকারের থেরাপড ডায়নোসর থেকে পাখির উদ্ভব ঘটেছে। Saurischia বর্গের ডায়নোসরদের কটিদেশের গঠনের সাথে গিরগিটির (Lizard) কটিদেশের গঠনের সাথে মিল আছে। Ornithischia বর্গের ডায়নোসরের ফসিলে (যেমন হংসচঞ্চু বা Duck billed ডায়নোসর) পালকের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি এবং এদের চামড়ার গঠন দেখে বোঝা যায় Ornithischia বর্গের ডায়নোসরের শরীরে পালক ছিল না। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে চীনের উত্তর-পূর্ব লায়নিং প্রদেশে প্রাপ্ত এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন (প্রায় ১৫০-১২০ মিলিয়ন বছর আগের) Sinosauropteryx প্রজাতির থেরাপড ডায়নোসরের চার ফুট লম্বা, আড়াই কেজি ওজনের ফসিল পাওয়া গেছে। যার শরীরে দুই মিলিমিটার দৈর্ঘ্যরে পালক-সদৃশ গঠন মোটামুটি স্পষ্ট, গঠন থেকে বোঝা যায় থেরাপড ডায়নোসরটি উড়তে পারতো না।(১০) একই সময়ে ঐ জায়গা থেকে পাওয়া যায় ১২১ থেকে ১৩৫ মিলিয়ন বছর পুরাতন (ক্রিটেসাস পিরিয়ড সময়কালীন) Saurischia বর্গের Protarchaeopteryx robusta প্রজাতির ছোট থেরাপড ডায়নোসরের আরেকটি ফসিল; এটি প্রায় তিন ফুট লম্বা, সরু হাড়যুক্ত লেজ, ক্ষুদ্র বাহু, পালকের অস্তিত্ব দৃশ্যমান। যদিও প্রটারকেইঅপটেরিক্সের ফসিলে পালকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে কিন্তু পালক পরীক্ষা করে জানা গেছে পালকের আকার-আকৃতি, দেহের সাথে সংযুক্তি ইত্যাদির মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে, ফলে এটি থেরাপড ডায়নোসরের দেহের ভার বহন করে উড়তে সক্ষম নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়তো কোনো এক সময় থেরাপড ডায়নোসদের ত্বকে বিশেষ মিউটেশনের ফলে পালকের উদ্ভব ঘটলেও উড়বার জন্য তা উদ্ভূত হয় নি বরং এই পালক পরবর্তীতে থেরাপড ডায়নোসরের দেহকে তাপ থেকে রক্ষা করা আর অন্তরণের কাজে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ আকাশে উড়ার জন্য আধুনিক পাখির পালকের উদ্ভব ঘটে নি বরং পালক পাখির পূর্বপুরুষ ছোট আকারের থেরাপড ডায়নোসরদের মধ্যে বেশ আগে থেকে ছিল। কিন্তু তারা উড়তে পারতো

না। বেইজিং-এর Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology -এর প্রত্নজীববিজ্ঞানী Xu Xing এবং তার সহকর্মীরা ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা নেচার-এ জানিয়েছেন(১১) চীনের উত্তর-পূর্ব লায়নিং প্রদেশে পাওয়া নতুন প্রজাতির ডায়নোসর মাইক্রোরেপ্টর গুই (Microraptor gui)-এর তিন ফুট লম্বা ফসিলে (১২৮ থেকে ১২৪ মিলিয়ন বছরের পুরানো) চারটি পাখা, লম্বা লেজের অস্তিত্ব দৃশ্যমান। ফলে বোঝা যায় এই পাখার সাহায্যে তারা হয়তো একসময় গাছ থেকে গাছে উড়ে যেতে পারতো। চাইনিজ বিজ্ঞানীদের মত হচ্ছে, চার পাখার ডায়নোসর মাইক্রোরেপ্টর গুই পাখির সরাসরি পূর্বপুরুষ না হলেও ডায়নোসর এবং পাখিদের নিকট সাধারণ আত্মীয়।

এতো গেল ডায়নোসরদের কথা। এবার সদ্য পাওয়া পাখির ফসিলের কথা শোনা যাক। চীনের সেই 'ফসিল অঞ্চল' বলে খ্যাত লায়নিং প্রদেশে Sinornis জিনাসের (গণ) অন্তর্ভুক্ত Sinornis santensis প্রজাতির পাখির আট ফুট দীর্ঘ ফসিল পাওয়া গেছে। ফসিলগুলো প্রায় ১০০ থেকে ১২০ মিলিয়ন বছর পুরাতন অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জির হিসেবে ক্রিটেসাস পিরিয়ডের শেষের দিককার। সিনরনিস্ পাখির ফসিলটির বৈশিষ্ট্য হল, এর লম্বা সরু আঙ্গুল এবং দাঁত রয়েছে, যা আধুনিক পাখির মধ্যে মোটেও দেখা যায় না (কিন্তু ডায়নোসরদের মধ্যে ছিল)। আমেরিকার প্রত্নজীবিজ্ঞানী পল সেরেনো (Paul Sereno) বলেন 'ফসিলটির জোড়া লাগানো চোয়াল, বক্ষাস্থি এবং সামনের বাহুর (forelimb) গঠন দেখে বোঝা যায়, এরা শিকার ধরে খেত এবং ডায়নোসর-সদৃশ এই লম্বা পাখিগুলি বোধহয় সর্বপ্রথম সাচ্ছন্দে আকাশে উড়তে পারতো'। (১২)

উৎসনির্দেশঃ

(১) Charles Darwin, The Origin of Speicies, Reprint 2006, W. R. Goyal Publishers (Indian Edition), Delhi, Page 159.

(২) আরও দেখুন, Glen Kuban, Where Fossils are Found,
http://paleo.cc/kpaleo/fossfind.htm

(৩) মোহাম্মদ শাহ আলম, সাধারণ প্রত্নজীববিদ্যা, ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৩।

(৪) আজ থেকে প্রায় ৪৪০ মিলিয়ন বছর আগে (অর্ডোভিসিয়ান পিরিয়ডে) তীব্র শৈত্য প্রবাহের দরুন বৈশ্বিক পরিবেশের মারাত্মক পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানীরা একে প্রথম বৃহৎ গণবিলুপ্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ সময় সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বিশাল অংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভূমিতে হয়তো এ সময় কোনো জীবের অস্তিত্ব ছিল না। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন এ সময় সামুদ্রিক জীবের প্রায় ২৫% গোত্রের (family) বিলুপ্তি ঘটে। কয়েকটি থেকে কয়েক হাজার প্রজাতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক সাদৃশ্যতার উপর ভিত্তি করে জীবজগতের শ্রেণীবিন্যাসে 'গোত্র' গঠন করা হয়েছে। ৩৭০ মিলিয়ন বছর আগে বৈশ্বিক শৈত্য, সমুদ্রের পানির উচ্চতা নেমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে ডেভোনিয়ান পিরিয়ডে গণবিলুপ্তি হয়। এতে প্রায় ১৯% গোত্র বিলীন হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের হিসেবে সবচেয়ে বৃহৎ গণবিলুপ্তি ঘটেছে আজ থেকে প্রায় ২৪৫ মিলিয়ন বছর আগে, পার্মিয়ান পিরিয়ডে। এ সময়কালে ৫৪% প্রাণীর গোত্র, ৯৫% সমস্ত সামুদ্রিক প্রজাতি এবং প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদের মৃত্যু হয়েছে। এই বৃহৎ গণবিলুপ্তির জন্য দায়ী করা হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরের টেকটোনিক প্লেটগুলোর মধ্যেকার সংঘর্ষকে। পাশাপাশি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, ও সমুদ্রের অভ্যন্তর থেকে মিথেন-হাইড্রেটের আকস্মিকভাবে অধিক হারে নির্গমনকেও অনেক ভূতাত্ত্বিক দায়ী করে থাকেন। চতুর্থ বৃহৎ গণবিলুপ্তির ঘটনার সময়কাল আজ থেকে প্রায় ২১০ মিলিয়ন বছর আগে, ট্রায়াসিক পিরিয়ডের একদম শেষের দিকে। সমুদ্রের পানির উচ্চতার দ্রুত গতিতে হ্রাসবৃদ্ধি, ভূত্বকে উল্কাপিণ্ড, ধূমকেতুর আঘাত, আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের কারণে এ সময় বৃহৎ গণবিলুপ্তির ঘটনা ঘটে| এ সময় প্রাণীজগতের ২৩% গোত্র পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যায়। অবশ্য এই গণবিলুপ্তির ঘটনার পরে পৃথিবীর স্থলভাগে বৃহৎ জীব ডায়নোসরের আবির্ভাব। সর্বশেষ বৃহৎ গণবিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছে ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে, ক্রিটেসাস পিরিয়ডের একদম শেষের দিকে এবং টারশিয়ারি পিরিয়ডের প্রথম দিকে। এ সময় ডায়নোসর, মোসাসেরাসসহ বৃহৎ সামুদ্রিক ও স্থলচর জীবের নির্বিশেষে বিলুপ্তি ঘটে। দ্রষ্টব্য:
http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/eldredge2.html|

(৫) প্রত্নজীববিদদের ফসিল অনুসন্ধান-গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে দেখুন:
http://www.nmnaturalhistory.org/science/geoscience/collecting_fossils/index.html।

(৬) ভূতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর উৎপত্তির পর থেকে ৪৫০০ থেকে ৫৪৩ মিলিয়ন বছর পর্যন্ত সময়কালকে প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ড বলে অভিহিত করে থাকেন| পৃথিবীর উৎপত্তি থেকে পাললিক শিলার উদ্ভবের আগের সময়ের কোনো ফসিল পাওয়া যায় নি| পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার আর্কিয়ান শিলায় পাওয়া ৩.৫ বিলিয়ন বছরের পুরাতন সায়ানেব্যাকটেরিয়ার ফসিলই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন ফসিল| আর সবচেয়ে প্রাচীন পাললিক শিলাখণ্ডের বয়স ৩.৮ বিলিয়ন বছর| প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভব ঘটে| এ সময় সায়ানোব্যাকটেরিয়া, আরকিয়ান, ব্যাকটেরিয়া জাতীয় প্রাক-স্বকেন্দ্রীণকোষী জীবের বিকাশ ঘটে| প্রাক-স্বকেন্দ্রীণকোষী জীব থেকে স্বকেন্দ্রীণকোষী জীবেরও উদ্ভব এ সময়| প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষের দিকে শৈবাল, জেলিফিস, স্পঞ্জ, কৃমি জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব| ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ সম্পর্কে আরো জানা যাবেঃ The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy) (2005). “Index to Creationist Claims” edited by Mark Isaak, from http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC300.html|

(৭) চার্লস সুল্লিভান ও ক্যামেরন ম্যাকফেরসন স্মিথ, বিবর্তন নিয়ে চারটি ভ্রান্ত ধারণা, (অনুবাদ অভীক দাস), যুক্তি, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি ২০১০, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, সিলেট, পৃষ্ঠা ৭৯|

(৮) Dr. Penny Higgins, Use and Abuse of the Fossil Record: The Case of the ‘Fish-ibian’, The Committee for Skeptical Inquiry,
http://www.csicop.org/specialarticles/show/use_and_abuse_of_the_fossil_record_the_case_of_the_fish-ibian

(৯) Chris Nedin, All About Archaeopteryx,
http://www.talkorigins.org/faqs/archaeopteryx/info.html

(১০)
http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/dinos/Sinosauropteryx.shtml

(১১)
http://news.nationalgeographic.com/news/2003/01/0121_030122_dromaeosaur.html

(১২) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1561420/Sinornis-santensis
এবং, http://www.bsu.edu/web/00cyfisher/sinornis.htm

অতিরিক্ত পাঠের জন্য:

- Donald R. Prothero, Evolution: What the Fossils Say and Why It Matters, 2007, Columbia University Press.
- Neil Shubin, Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body, 2008, Pantheom Books, Newyork.
- The Paleontological Society, USA: http://www.paleosoc.org/
- http://www.lakeneosho.org/index.html

পিল্টডাউনের শিক্ষাঃ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই হচ্ছে জ্ঞান আহরণের একমাত্র পথ

ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে হোমিনিড ফসিল রেকর্ড যথেষ্ট সংখ্যক ছিল না; যার দ্বারা তারা মানুষের উদ্ভব এবং বিবর্তন বিষয়ে পরীক্ষণযোগ্য একটি অনুকল্প তৈরি করতে পারতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নৃবিজ্ঞানে প্রচলিত সবচেয়ে নেতৃস্থানীয় অনুকল্প ছিল 'কোন বৈশিষ্ট্যটি আমাদের মানুষ বানিয়েছে'। এপ-সদৃশ এবং মানব-সদৃশ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু হোমিনিড ফসিল সেসময় আবিষ্কার হয়েছিল, যার ফলে প্রশ্ন দেখা দেয়, হোমিনিড ফসিলগুলোর সাথে মানুষের কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থান থাকলেও প্রকৃতিতে মানুষের স্বতন্ত্র অবস্থান কোথায়। প্রশ্নটি অনেককেই তখন ভাবিয়ে ছিল। নৃবিজ্ঞানীদের কাছেও এর সম্ভাব্য উত্তর ছিল 'বড় মস্তিষ্ক'। বড় মস্তিষ্কই আমাদেরকে জীবজগতে শ্রেষ্ঠতর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাই নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা করছিলেন সবচেয়ে প্রাচীন হোমিনিড বা মানুষের পূর্বপুরুষ বা মিসিং লিংক বা সবচেয়ে প্রথম মানবের মস্তিষ্ক অবশ্যই বড় হতে হবে। বড় মস্তিষ্ক ছাড়া জীবটি যতই আমাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হোক না কেন, এটি এপ-ই হবে; এটি মোটেও মানুষ নয় কিংবা মানুষের পূর্বপুরুষ বা মিসিং লিংক হতে পারে না। লন্ডনের রয়েল কলেজের সার্জন এবং সেসময়কার প্রভাবশালী নৃবিজ্ঞানী স্যার আর্থার কিথ (১৮৬৬-১৯৫৫) বলতেন মানুষের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। সে সময়কার ফসিল রেকর্ডে সংগৃহীত তথ্য খুব বেশি ছিল না যার

দ্বারা আর্থার কিথের বক্তব্য এবং মানুষের উদ্ভব সংক্রান্ত তার অন্যান্য অনুকল্পগুলো খণ্ডন করা যায় কিংবা সমর্থনও করা যায়।

অনেকটা আকস্মিকভাবেই নৃবিজ্ঞান জগতে বিরাট মোড় নেয়। ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের পূর্ব-সাসেক্সের পিল্টডাউন গ্রাম থেকে বেশ কিছু ফসিল আবিষ্কৃত হয়। এই আট বছরের ঘটনাবলীর সময়সূচি অনেকটা এরকম: ১৯০৮ সালের দিকে বিশেষ করে, শৌখিন অপেশাদার ব্রিটিশ পুরাতাত্ত্বিক চার্লস ড্যাসন (১৮৬৪-১৯১৬) দাবি করেন, ঐ এলাকা থেকে তিনি কিছু হাড়গোড়ের খণ্ডাংশ পেয়েছেন। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যোগাযোগ করেন লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্টি মিউজিয়ামের কিউরেটর স্যার আর্থার স্মিথ উডওয়ার্ডের সাথে। একটি করোটির ফসিল পেয়েছেন সেটা দেখানোর উদ্দেশ্যে। ঐ বছরের জুন মাসে কিউরেটর উডওয়ার্ডের সাথে ড্যাসন এবং ফরাসি প্রত্নজীববিজ্ঞানী এবং ধর্মপ্রচারক পিয়ের টেউলহার্ড দ্যা শার্ডিন যৌথভাবে ফসিল সন্ধানে যান পিল্টডাউন গ্রামে(১)। ওখান থেকে হাতির দাঁত, করোটির হাড়ের টুকরোসহ কিছু নমুনা উদ্ধার করেন তারা। এরপর আবার একটি করোটির ডানপার্শ্বের অংশ এবং চোয়ালের হাড় পাওয়া গেছে শোনা যায়। একই বছরের নভেম্বর মাসে ব্রিটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা হেডলাইন করে(২): “THE EARLIEST MAN?: REMARKABLE DISCOVERY IN SUSSEX. A SKULL MILLIONS OF YEARS OLD” এবং ডিসেম্বরে এই ফসিলের আনুষ্ঠানিক একটি প্রেজেন্টেশন হয়। ডাক নাম দেয়া হয় পিল্টডাউন ম্যান। ফসিলের নমুনা বলতে মূলত একটি খুলি, চোয়াল, দুটি পেষক দাঁত। পিল্ট ডাউনের এই বিখ্যাত (বলা যায় কুখ্যাত-ও) ফসিল উদ্ধারের সঠিক তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায় না। বলা হয়ে থাকে, ১৯১২ সালে পিল্টডাউনের এক নুড়ি পাথরের গর্ত থেকে এটি উদ্ধার হয়েছিল। আবার সন্দেহবাদীরা বলেন, এক বা দুই বছর পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্পেসিমেন প্রকাশ করা হয়, যেগুলো চার্লস ড্যাসন ১৯১৫ সালের দিকে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু কিউরেটর উডওয়ার্ড ১৯১৬ সালে চার্লস

ড্যাসনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এগুলোর আবিষ্কার সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো বর্ণনা দেন নি।(৩)

পিল্টডাউন ফসিলের বিচ্ছিন্ন নমুনাগুলো উদ্ধারের পর অতি যত্নের সাথে পুনর্গঠন করেন কিউরেটর স্যার আর্থার স্মিথ উডওয়ার্ড, নৃবিজ্ঞানী স্যার এলিয়ট স্মিথ এবং নৃবিজ্ঞানী স্যার আর্থার কিথসহ আরো কয়েকজন। খুলিটি দেখতে অনেকটা আধুনিক মানুষের মত ছিল, এর করোটির আয়তন ১৪০০ সি. সি.। অর্থাৎ পুরোপুরি আধুনিক মানুষের (Homo sapiens) সমান। কিন্তু খুলিটির সাথে যে দুইটা পেষক দাঁত পাওয়া গেছে, এগুলো আধুনিক মানুষের দাঁতের মত নয়, বরং এপদের দাঁতের সাথে মিল বেশি। পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে জাভা মানব (Homo erectus) বা অন্যান্য যেসব হোমিনিডের জীবাশ্ম আবিষ্কার হয়েছে,তাদের মাথার চেয়ে চোয়াল ছিল অধিক বিকশিত, আর করোটির ধারণ ক্ষমতা ছিল কম বিকশিত। পিল্টডাউনের ফসিলটি ঠিক বিপরীত। করোটির ধারণক্ষমতা প্রায় আধুনিক মানুষের মত আর চোয়ালের বৈশিষ্ট্য অনেক অনুন্নত। দুইটি পেষক দাঁত শিম্পাঞ্জির দাঁতের মত এবং চোয়ালের দুই পাশ প্রায় সমান্তরাল। এসব বৈশিষ্ট্য অনেক আদিম। তাই এ ধরনের অদ্ভুত ফসিল আবিষ্কারে স্বাভাবিকভাবেই আবিষ্কারক দল খুবই উত্তেজনা বোধ করে। তারা প্রচার করতে লাগলেন 'এই প্রথম বড় মস্তিষ্কের এমন একটি মানুষের পূর্বপুরুষের (মিসিং লিংক) ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে যা এতদিন ধরে নৃবিজ্ঞানীরা শুধু কল্পনাই করে আসছিলেন।' বলা হতে লাগলো এটিই প্রথম ইংরেজ-মানব। উডওয়ার্ড নতুন ফসিলটির নাম দিলেন Eoanthropus dawsoni (শেষের নামটি আবিষ্কারক চার্লস ড্যাসনের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা)। স্বাভাবিকভাবে খবরটি গোটা দুনিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল: বড় মস্তিষ্কের মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিল পাওয়া গেছে, সম্ভাব্য প্লিওসিন যুগের (ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জি অনুসারে এই যুগের মেয়াদ ছিল আজ থেকে ৫.৩৩২ মিলিয়ন থেকে ২.৫৮৮ মিলিয়ন বছর আগে) এবং এরা ইংল্যান্ডেই বাস করতো।

এই ধরনের চটকদার খবরে সাধারণ মানুষসহ সেই সময়ের অনেক নৃবিজ্ঞানীই কান দিলেও গুটিকয়েক নৃবিজ্ঞানী আবার এ ধরনের আবিষ্কারকে সন্দেহের চোখে দেখেন। ফসিলটির রহস্যময় বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা ভিন্নমত প্রকাশ করেন। জার্মানির প্রখ্যাত এনাটমি বিশেষজ্ঞ এবং নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্র্যান্জ উয়েইডেনরিখ (Franz Weidenreich, ১৮৭৩-১৯৪৮) ১৯২৩ সালের দিকে ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেন ফসিলটির মুখমণ্ডলের নিম্নাংশ বা চোয়াল (Jaw) খুব বেশি পরিমাণ এপসদৃশ, তাই এটি কোনো এপের চোয়াল হবে, মানুষের নয়। দুই বছর পর, আরেকজন সুইডিশ ভূতত্ত্ববিদ জোহান গুনার এন্ডারসন এক রিপোর্টে জানান, পিল্টডাউনের জিওলজিতে ভুল আছে। সোয়ানকম্ব (Swancombe) জীবাশ্মের আবিষ্কারক এবং দন্তচিকিৎসাবিদ এলান টি. মারস্টন ফসিলটির দাঁতের গঠন দেখে বিশেষভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এসব ভিন্নমত বা নেতিবাচক বক্তব্যকে সেই সময়কার ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা থোড়াই কেয়ার করলেন। ইংল্যান্ডের সাধারণ জনগণও এগুলোকে কানে তুলতে চাইলো না। 'অচ্ছুত' আফ্রিকা থেকে কত গুরুত্বপূর্ণ ফসিল উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক, এশিয়া থেকেও হচ্ছে, ইউরোপের ভিতরে জার্মানি থেকে নিয়ান্ডারথাল ফসিল আবিষ্কার হয়েছে, ফ্রান্স থেকেও আবিষ্কার হয়েছে ফসিল, নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় অনেক এগিয়ে গেছে তারা, আর বিশ্বরাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র ইংল্যান্ড এতদিন ফসিল আবিষ্কার থেকে বঞ্চিত। তাই এবারে মানুষের পূর্বপুরুষের এই গুরুত্বপূর্ণ ফসিল উদ্ধার ইংল্যান্ডবাসীর মনে বিরাট গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ মিডিয়ার বৃহৎ প্রচারণায় চারিদিকে জয়জয়কার। আর নৃবিজ্ঞানের জগতে পিল্টডাউন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নেয় কয়েক দশকের জন্য হলেও।

পিল্টডাউন ফসিল আবিষ্কারের এক দশক পর নতুন আরেকটি ফসিল আবিষ্কার ঘটে ১৯২৪ সালে, ইংল্যান্ড থেকে হাজার খানেক মাইল দূরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানকার টাউং গ্রামের পাশের একটি চুনাপাথরের কুয়োরি থেকে। খনিতে কাজ করতে গিয়ে একজন কুয়োরি শ্রমিক হঠাৎ করেই একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ খুলি, একাধিক

দাঁত এবং কিছু হাড়গোড় পায়। পরে এগুলোকে পরীক্ষার জন্য জোহানেসবার্গের উইটওয়াটারস্রেন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের তরুণ এনাটমিস্ট এবং স্নায়ুবিজ্ঞানী রেমন্ড ডার্টের (১৮৯৩-১৯৮৮) কাছে পাঠানো হয়। রেমন্ড ডার্ট মানব-বিবর্তন নিয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী ব্যক্তি। তিনি জানতেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কয়েক মিলিয়ন বছর আগে এপ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আফ্রিকার যে অঞ্চলে এখন এপ আছে তার দূরত্ব (ডার্টের অবস্থান থেকে) প্রায় দুই হাজার মাইল। তাই মানুষ বা হোমিনিডের কোনো জীবাশ্ম দক্ষিণ আফ্রিকাতে পাওয়া যাবে এমন আশা করেন নি কখনো। তবে আফ্রিকাতেই কেন এবং কিভাবে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে সে সম্পর্কে জানতে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন।

রেমন্ড ডার্টের কাছে আসা ফসিলের নমুনা মানে করোটির কাস্ট বা জমাট চুনাপাথরের মধ্যে করোটির ছাপ, যার মধ্যে শিরা-উপশিরাসহ মগজের ভাঁজগুলো খুব স্পষ্ট ছিল, দেখে ভেবেছিলেন এটি বোধহয় কোনো বেবুনের ফসিল হতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জীবাশ্মবিদ না হলেও এবং তার কাছে সঠিক যন্ত্রপাতি না থাকলেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ৭৩ দিন ধরে করোটির হাড়, চোয়াল এবং দাঁতে লেগে থাকা চুনাপাথরের টুকরো পরিষ্কার করে চললেন। পরিষ্কারের কাজ শেষে ডার্ট বুঝতে পারলেন এটি কোনো বেবুনের ফসিল নয়। এটি একটি শিশুর মাথার খুলি। খুলিটিতে ছোট এবং চ্যাপ্টা ছেদক দন্ত রয়েছে। মানুষের মতই এই করোটির ফোরামেন ম্যাগনামের (foramen magnum) অবস্থান খুলির নীচের দিকে, যা নির্দেশ করে এটি সোজা হয়ে দুই পায়ে হাঁটতে পারতো। ডার্ট বুঝতে পারলেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্ব ফসিল যা থেকে ডারউইনের বক্তব্যের সঠিকতা প্রমাণ করে-'মানুষের পূর্বপুরুষ আফ্রিকাতেই ছিল।' ডার্ট ১৯২৫ সালে ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত বিশ্বের প্রথম সারির বিজ্ঞান জার্নাল নেচারে টাউং শিশুর ফসিলের কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "এটি কোনো আধুনিক মানুষের ফসিল নয়। এবং পুরোপুরি বর্তমানের এপ নয়। এটি বর্তমান জীবিত এনথ্রোপয়েড এবং মানুষের মধ্যবর্তী বিলুপ্ত জাতের এপ হবে।" ডার্ট

ফসিলটিকে আমাদের Homo জিনাসের (গণ) পূর্বের আরেকটি জিনাস Australopithecus অন্তর্গত স্বতন্ত্র প্রজাতিরূপে শ্রেণীবিন্যাস করেন: ‘Australopithecus africanus’। বাংলায় আফ্রিকার দক্ষিণের এপ। ফসিলটির ডাক নাম হয়ে গেলে টাউং শিশু। আধুনিককালের প্রত্নস্নায়ুবিজ্ঞানী ডিন ফক টাউং শিশু গবেষণা করে জানিয়েছেন টাউং শিশুর মস্তিষ্ক যতটুকু না মানব-সদৃশ তার থেকে বেশি এপ-সদৃশ। বয়স ডেটিং করে জানা গেছে এটি প্রায় ২৫ লক্ষ বছর (আপার প্লিওসিন যুগের) আগের এবং করোটির ধারণক্ষমতা (৩৪০ সি. সি.) দেখে বোঝা যায় এপের মত এর ছোট মস্তিষ্ক, যা পিল্টডাউন ফসিলের মস্তিষ্কের তিন ভাগের একভাগ হবে। (১৯২৪ সালের টাউং শিশুর খুলিটিই বিশ্বের প্রথম প্রাপ্ত অস্ট্রেলোপিথেসাইনদের মাথার খুলি।)

আধুনিক মানুষের পপুলেশনের সাথে টাউং শিশুর দাঁতের গঠন ও বৃদ্ধি তুলনা করে জানা যায়,মৃত্যুকালে ঐ ব্যক্তির বয়স ছিল প্রায় ছয় বছর। পরবর্তীতে আরো উন্নত বৈজ্ঞানিক গবেষণা,যেমন ত্রিমাত্রিক কম্পিউটার ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে টাউং শিশুর মাড়িতে দাঁতের অবস্থান এবং আরো কিছু অপ্রকাশিত শারীরিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নত করা হয়। এর ফলে টাউং শিশুর দাঁতের বৃদ্ধি আরো সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। দাঁতের অবস্থান এবং বৃদ্ধি মানুষের তুলনায় বরং এপের সাথে সাদৃশ্য বেশি। এবং পূর্বে যা জানা গিয়েছিল,মৃত্যুকালে টাউং শিশুর মৃত্যুকালে বয়স ছিল আরো কম। মাত্র তিন থেকে চার বছর হবে।(৪) উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের প্রথম দিকে বিবিসি জানায়,টাউং শিশুটির খুলি এবং চক্ষুগহ্বরে আঘাতের চিহ্ন দেখে, ফসিলবিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন এ শিশুটি ঈগল অথবা এই ধরনের বড় কোনো শিকারী পাখি আক্রমণে মারা গেছে।

কিন্তু রেমন্ড ডার্টের এ অভূতপূর্ব আবিষ্কার সময় সুযোগ মত আসে নি। ডার্টের টাউং শিশু বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে গৃহীত হয়েছিল আদি মানুষের বিবর্তনের জটিল নমুনা হিসেবে। মানুষের পূর্বপুরুষ বা মিসিং লিংক হিসেবে এটি স্বীকৃতি পায়নি তখন। দীর্ঘ

৩০টি বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল রেমন্ড ডার্টকে স্বীকৃতি পাবার জন্য। শুধু নিছক আরেকটি এপের ফসিল হিসেবে মনে করেছিলেন তৎকালীন বিজ্ঞানীরা। রেমন্ড ডার্টের এই বঞ্চনার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে: ডার্টের আবিষ্কৃত জীবাশ্মের নমুনা মাত্র একটি। জীবাশ্মটির উরুর হাড় (ফিমার) বা শ্রোণীচক্র পাওয়া যায় নি, তাই (সমালোচকদের মত ছিল) শুধুমাত্র করোটির ফোরামেন মেগনামের অবস্থান থেকে নির্ভরযোগ্যতার সাথে বলা যাবে না, প্রাণীটি সোজা হয়ে হাঁটতে পারতো কিনা? রেমন্ড ডার্টের কাছে ঐ সময় এগুলোর কোনো জবাব ছিল না। তাছাড়া বিজ্ঞানী গোষ্ঠীর এক বড় অংশের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল 'পিল্ট ডাউন' নামক তথাকথিত মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিলের ওপর। আরেক অংশের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এশিয়ার ওপর। জার্মানির প্রখ্যাত বিবর্তন বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল (১৮৩৪-১৯১৯) বলেছিলেন 'এশিয়ার গ্রেট এপের (ওরাংওটাং) সাথে মানুষের এনাটমির অভূতপূর্ব মিল রয়েছে, আফ্রিকার গ্রেট এপদের তুলনায়। সুতরাং আফ্রিকা নয়, বরং এশিয়াই হবে হোমিনিডদের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি।' হেকেল ছাড়াও এশিয়াতেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছে এখানেই মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিল পাওয়া যেতে পারে, এমন ভাবনায় তখন অনেকেই আচ্ছন্ন ছিলেন। তাই সেসময় রেমন্ড ডার্ট যতই তার এই আবিষ্কার নিয়ে বিজ্ঞানীদের নজর কারার চেষ্টা করেন, ততই টাউং শিশুর 'ছোট এই করোটি এপের করোটির সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই এটি এপই হবে'-সমালোচকরা সহজেই এই ধরনের দাবি তুলে ডার্টের উৎসাহে পানি ঢেলে দেয়। আসলে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে যে ধরনের ভাবনা তখন নৃবিজ্ঞানী মহলে প্রচলিত ছিল তার সাথে পিল্টডাউন ফসিল যথেষ্ট খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

গল্পটি বোধহয় এখানেই শেষ হয়ে যেত, যদি না এটি বিজ্ঞান হতো। বিজ্ঞান হচ্ছে স্বতসংশোধনশীল প্রক্রিয়া। সংশয়, সন্দেহ, যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ, গবেষণা বিজ্ঞানের প্রাণশক্তি। এরপরও বলতে হয় এক বা একাধিক বিজ্ঞানীর ভুল হতে পারে, ভুল করতে পারেন। ভ্রান্ত ধারণা, জাত্যাভিমানসহ বিভিন্ন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা

প্রভাবিত হতে পারেন। বিজ্ঞানীরা তো সমাজবিচ্ছিন্ন কেউ নন। তবু এক বা একাধিক বিজ্ঞানী ভুল করলেও সারা বিশ্বে হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা সংশয়বাদিতার আলো জ্বেলে রেখে বিজ্ঞান গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যান। বিজ্ঞানে যতই দেরি হোক, যতই প্রতিষ্ঠিত মতামত বা তত্ত্ব হোক না কেন, ভুল ধরা পড়লে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে শুধরে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করে না। পিল্টডাউনের ঘটনাবলী বিজ্ঞানের এই স্বতসংশোধনশীল প্রক্রিয়াকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময় রেমন্ড ডার্ট এবং তার সহযোগীরা দক্ষিণ আফ্রিকার আলাদা আলাদা স্থান থেকে অস্ট্রেলোপিথেসাইনের আরো কিছু ফসিল উদ্ধার করেন: প্রথমে স্টার্কফন্টেইন থেকে, কিছুকাল পরে ক্রোমডুরাই, সোয়ার্টক্রান্স এবং মাকাপংসাট এলাকা থেকে। ফসিল আবিষ্কারের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল হচ্ছে জোহানেসবার্গে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত স্টার্কফন্টেইন অঞ্চল। এখানে অসংখ্য চুনাপাথরের গুহা আছে। কয়েক দশক ধরে এসব এলাকা থেকে প্রচুর হোমিনিডের ফসিল উদ্ধার হয়েছে, এর মধ্যে আছে অস্ট্রেলোপিথেসাইন, হোমো, প্যারানথ্রোপাস গণের ফসিল। তাই এই জায়গাকে নৃবিজ্ঞানীরা ‘মানব জাতির দোলনা’ হিসেবে অভিহিত করেন। ২০০০ সালে ইউনেস্কো এ অঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবেও ঘোষণা করেছে। ১৯৪০ সালের শেষের দিকে এখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হোমিনিডের ফসিল উদ্ধার হয়েছে। যেমন ১৯৪৭ সালে উইটওয়াটারস্রেন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রবার্ট ব্রুম এবং জন টি. রবিনসন একটি করোটি উদ্ধার করেন। করোটিটি একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর। এর ধারণক্ষমতা ৪৫০ সি. সি.। সাথে পাওয়া যায় প্রায় সম্পূর্ণ মেরুদণ্ড, উরুর হাড়, পাজরের হাড়, শ্রোণী। আমরা জানি জীবাশ্মায়নের ঘটনা দুর্লভ হলেও এই ফসিলটি খুব ভালোভাবেই সংরক্ষিত ছিল। প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকারীরা এর নাম দেন ‘Plesianthropus transvaalensis’ এবং ডাক নাম দেয়া হয় ‘মিসেস প্লেস’। এই নামেই সে বিখ্যাত। পরবর্তীতে অবশ্য ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে মিসেস প্লেস আলাদা কোনো জিনাস বা গণের

স্বতন্ত্র প্রজাতি নয়, এটি Australopithecus africanus প্রজাতির সদস্য। বয়স ডেটিং করে দেখা গেল এটি প্রায় ২.৩ থেকে ২.৮ মিলিয়ন বছরের পুরাতন। অর্থাৎ এটিও আপার প্লিওসিন যুগের। উদ্ধার হওয়া প্লেসের প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কাল থেকে খুব পরিষ্কার এবং অবিতর্কিতভাবে প্রমাণ করে এটি ছিল দ্বিপদী। প্লেসের উরুর হাড় আধুনিক মানুষের মত অনেকাংশেই, মানুষের মত এর ফোরামেন মেগনামের অবস্থান ছিল খুলির নীচের দিকে (অর্থাৎ এটি ছিল দ্বিপদী)। ফসিলটিতে দেহের বিভিন্ন অংশ এত পূর্ণাঙ্গভাবে রক্ষিত ছিল, যা পুনর্গঠিত 'Eoanthropus dawsoni' বা পিল্টডাউন ফসিলেও পাওয়া যায়নি।

১৯৫০-এর শুরুর দিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এত বেশি হোমিনিড ফসিল উদ্ধার পেতে লাগলো, প্রখ্যাত ব্রিটিশ এনাটমি বিশেষজ্ঞ স্যার উইলফ্রেড ল্যা গ্রোস ক্লার্ক (১৮৯৫-১৯৭১) জোরালো কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, রেমন্ড ডার্টই সঠিক-পিল্টডাউন নয়, Australopithecus africanus -ই মানুষের পূর্বপুরুষ।

ক্লার্কের এ বক্তব্যে সবাই যেন চমকে উঠলো। প্রশ্ন দেখা দিল Australopithecus africanus -ই যদি মানুষের পূর্বপুরুষ হয়, পিল্টডাউন ফসিলটা কিসের বা কার? সারা বিশ্বের নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। পিল্টডাউন ফসিলের সঠিকতা নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন এবং কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন তুলতে লাগলো,যা গত ত্রিশ বছর আগে এক ভিন্নমতের নৃবিজ্ঞানী ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে (চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে) রসায়নবিদ কেন্থ ওকলি ফ্লোরিনের পরিমাণ মেপে জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। ইংল্যান্ডের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম তখন পিল্টডাউন ফসিলের সঠিকতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আয়োজন করে ১৯৪৯ সালের দিকে। পরীক্ষার আয়োজন যতটা নৃবিজ্ঞানীদের কাছে চমকপ্রদ ছিল তার থেকে ঢের বেশি চমকপ্রদ ছিল পরীক্ষার ফলাফল: পেষক দাঁত এবং চোয়ালের হাড় পিল্টডাউনের খুলিতে কৃত্রিমভাবে সংযোজিত করা হয়েছে। ফ্লোরিন টেস্টে ধরা পড়ল করোটি এবং মুখমণ্ডলের নীচের চোয়াল সম্পূর্ণ আলাদা, দুইটি অংশের মধ্যে বয়সের

পার্থক্যও আছে;এবং ছেদক দাঁতগুলি ভিন্নসদৃশ ছিল। পিল্টডাউন ফসিলটি পৃথক তিনটি প্রজাতির হাড়ের মিশ্রণে বানানো হয়েছে,করোটি ছিল মধ্যযুগের এক ৪০ বছর বয়সী মানুষের,চোয়াল ছিল প্রায় পাঁচশত বছরের পুরাতন এক ওরাংওটাঙের (যা সংগ্রহ করা হয়েছিল তিউনিসিয়া থেকে) আর দাঁতগুলো ছিল শিম্পাঞ্জির। দাঁত ঘষে এবং রঙ করে পুরানো চেহারা দেয়া হয়েছে।(৫) ১৯৫৩ সালের ৩০ নভেম্বর টাইম ম্যাগাজিনে স্যার উইলফ্রেড ল্যা গ্রোস ক্লার্ক, যোসেফ উইনার এবং কেন্থ ওকলি যৌথভাবে লিখিত প্রবন্ধে পিল্টডাউন ম্যানের সব ভাঁওতাবাজি ফাঁস করেন এবং এর মাধ্যমে প্রায় চল্লিশ বছরের সকল নাটকের যাবনিকাপাত ঘটে।

চিত্র: বিজ্ঞানীরা পিল্টডাউনের ফসিল পরীক্ষা করে দেখছেন

এক বা একাধিক ব্যক্তি এই হাড়গুলো ইচ্ছেকৃতভাবে সংযোজন করে পিল্টডাউন ফসিল বানিয়েছে। কারা এই জোচ্চুরি সঙ্গে জড়িত তা নিশ্চিত হয়ে জানা না গেলেও

সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন চার্লস ড্যাসন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামের (বর্তমান নাম ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম) কিউরেটর মার্টিন হিনটন, ফরাসি প্রত্নজীববিজ্ঞানী পিয়ের টেউলহার্ড দ্যা শার্ডিনসহ আরো কয়েকজন। বলা হয়ে থাকে, স্যার আর্থার উডওয়ার্ডকে বোকা বানানো হয়েছিল কোনো না কোনোভাবে। আজ পিল্টডাউন ফসিলটি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নৃবিজ্ঞানের খাতা থেকেও বাতিল। মানব-বিবর্তনের ফসিলের রেকর্ডে তার কোনো অবস্থানই নেই। বিজ্ঞান জগতের জালিয়াতি,ভাঁওতাবাজি বা জোচ্চুরি ছাড়া, কোনো বিজ্ঞানের একাডেমিক আলোচনাতে বা পাঠ্যচর্চায় পিল্টডাউনের নামও উচ্চারিত হয় না। উল্লেখ্য, পিল্টডাউনের দীর্ঘদিনের জালিয়াতি উন্মোচন করেন বিজ্ঞানীরাই, কোনো ক্রিয়েশনিস্ট বা অন্যকেউ নন। এমন কি পিল্টডাউন ফসিল উদ্ধারের শুরুর দিক থেকে যারা সন্দেহ পোষণ করছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন তারাও ছিলেন বিজ্ঞানী। নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা পিল্টডাউনের জালিয়াতি ধরতে না পারলেও সন্দেহ পোষণকারী বিজ্ঞানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত দেখে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে নেন নি। বা চুপ মেরে থাকেন নি। তাদের সন্দেহের কথা প্রকাশ করেছিলেন স্বাভাবিকভাবেই। এখানেই বিজ্ঞানের স্বতন্ত্রতা। এমন কি, সবশেষে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে পিল্টডাউনের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, তা পরিকল্পনা-পরিচালনা করেন বিজ্ঞানীরাই।

অবশেষে রেমন্ড ডার্ট এবং তার টাউং শিশুর নৃবিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। মানব বিবর্তনের ফসিল রেকর্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেয় তার টাউং শিশু। গত ২০০০ সালে বিশ্বের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান পত্রিকা Science ঘোষণা করে 'বিংশ শতাব্দীতে শ্বাসরুদ্ধকর ২০টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে রেমন্ড ডার্টের টাউং শিশু আবিষ্কারও একটি; যা গোটা মানবজাতির জীবনে নতুন মাত্রা দিয়েছে।'

মানুষের উদ্ভব এবং বিবর্তন বিষয়ে এখনও অনেক কিছু জানার বাকি আছে আমাদের। যাহোক, সত্য কেবল জানা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেই।

বিজ্ঞানেই রয়েছে স্বতসংশোধনশীল (self-correcting) প্রক্রিয়া। আর পিল্টডাউন ঘটনাবলী থেকে এ বিষয়টিই আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

উৎসনির্দেশঃ

(১) http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man

(২) Piltdown Man: Case Closed, Miles Russell, Bournemouth University, http://www.bournemouth.ac.uk/caah/landscapeandtownscapearchaeology/piltdown_man_a.html

(৩) Michael Ruse, The Evolution Wars: A Guide to the Debates, 2002, Rutgers University Press, p 179

(৪) Clark Spencer Larsen, Robert M. Matter, Daniel L. Gebo, Human Origin: The Fossil Record, 1998, Waveland Press, Inc., USA, p 59

(৫) Mark Pallen, The Rough Guide to Evolution, 2009, London, Rough Guides Ltd., p 189

মিউটেশন নিয়ে নয় টেনশন

এ পৃথিবীতে ছয়শত কোটির অধিক মানুষ বসবাস করে। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে একমাত্র অবিকল যমজ (identical twin) ছাড়া আর কেউই হুবুহু এক রকম হয় না। প্রত্যেকেই যেন স্বতন্ত্র। একমাত্র অবিকল যমজ (identical twin) ব্যক্তি ছাড়া কোনো ব্যক্তির ফিনোটাইপ অন্য ব্যক্তির সাথে হুবুহু এক রকম নয়। তাহলে জিনগত আমাদের মিল কতটুকু? মানব জিনোম প্রকল্প হতে জানা গেছে, আমরা মানুষেরা (*Homo sapiens*) প্রত্যেকে ৩×১০^{৯} জোড়া ডিএনএ'র ক্ষার (base) শেয়ার করি। আমরা *Homo sapiens* -দের দুই ব্যক্তির মধ্যে কমপক্ষে ৬×১০^{৬} জোড়া ডিএনএ'র বেসে পার্থক্য রয়েছে। এমনিতে পার্থক্যের সংখ্যাটি অনেক বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু মানব জিনোমের মোট হিসাবে এটি মাত্র ০.১%; অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের জিনগত মিল প্রায় ৯৯.৯%। ২০০৬ সালে প্রকাশিত আমেরিকার Lawrence Berkeley National Laboratory -এর নিয়ান্ডার্থালদের ফসিল থেকে সংগৃহীত ডিএনএ'র উপর গবেষণা রিপোর্ট হতে জানা যায় আনুমানিক পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানুষের আরেক প্রজাতি নিয়ান্ডার্থালদের (*Homo neanderthalensis*) সাথে আমাদের (*Homo sapiens*) জিনগত মিল প্রায় ৯৯.৫%। জীবিত নিকট আত্মীয় শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের ডিএনএ'র মিল প্রায় ৯৮%। শুধু মানুষ নয়, যৌনপ্রজননশীল সকল জীবের ক্ষেত্রেই এই শারীরিক-চারিত্রিক বিভিন্নতা, ভ্যারিয়েশন সত্য। দৈহিক আকার-আকৃতি-আয়তন, গায়ের রঙ, চোখের রঙ, লোমের পরিমাণ, চামড়ার পুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে একই প্রজাতির সকল জীবের মধ্যে বা এক প্রজাতির সাথে আরেক প্রজাতির জীবের পার্থক্য রয়েছে

(ব্যতিক্রম শুধু অবিকল যমজ যারা)। যাহোক, এই যে শারীরিক-চারিত্রিক বিভিন্নতা, যার মাধ্যমে একে অপরকে আলাদা করে চেনা যায়, তাকে আজকের যুগের বংশগতিবিদ্যার ভাষায় বলা হয়ে থাকে ট্রেইট (Trait) কিংবা ফিনোটাইপ (Phenotype)।

জীবজগতের এই বিশাল বৈচিত্র্য-বিভিন্নতা-পার্থক্য উদ্ভবের কারণ নিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই ভেবে এসেছে। অনেকেই অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ধর্মবাদীরা চালিয়ে দিয়েছেন 'ঈশ্বরের মনের খেলা' বলে, দার্শনিকরা উত্তর খুঁজেছেন দ্বান্দ্বিকতায়। আর বিজ্ঞানীরা, বিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বংশগতি-প্রকরণ সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানতেন না। চার্লস ডারউইনও যেখানে জীবজগতের 'বৈচিত্র্য' নামক বাস্তবতাকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু তিনিও বংশগতিসহ ভ্যারিয়েশন (প্রকরণ) উদ্ভবের কারণ-প্রক্রিয়া নির্ণয়ে ভ্রান্ত ছিলেন। সেকালে ক্ষুদ্র পাওয়ালা ভেড়া-কুকুর, লেজহীন বিড়াল ইত্যাদি ধরনের জীবের প্রকরণকে বলা হত স্পোর্টস (sports)। ডারউইন অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থের 'প্রকরণের বিধি' (Laws of Variation) নামক পঞ্চম অধ্যায়ে 'ক্ষুদ্র ভ্রূণ' (gemmule) বলে একটি ধারণার কথা তুলে ধরেন, যেখানে বলা হয়-পিতামাতার অঙ্গগুলি থেকে বহু কণিকা রক্তে বাহিত হয় এবং সেখান থেকে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুতে যায় এবং সঙ্গমের সময় তাদের মিলন ঘটে।

বংশগতি সম্পর্কে প্রথম মোটামুটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন গ্রেগর মেন্ডেল নামের খ্রিস্টান এক পাদ্রি। সামান্য মটরশুঁটি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার ফলাফল তিনি প্রকাশ করেন 'ব্রুন প্রাকৃতিক ইতিহাস সমিতির সম্পাদিত কর্মবিবরণ' (*Transactions of the Brunn Natural History Society*) নামক অখ্যাত এক বিজ্ঞান পত্রিকায়।(১) ১৮৬৫ সালে মেন্ডেলের রচনাটি প্রকাশিত হলেও সেই সময়ের জীববিজ্ঞানী বা অন্য কেউ এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ১৯০০ সালে হল্যান্ডের হুগো দ্রাভিস (১৮৪৮-১৯৩৫), জার্মানির কার্ল করেনস

(১৮৬৪-১৯৩৩), অস্ট্রিয়ার এরিক সেরম্যাক (১৮৭১-১৯৬২) তিনজনই স্বতন্ত্রভাবে মেন্ডেলের বংশগতির নিয়মাবলী পুনরাবিষ্কার করেন। এই হুগো দ্রাভিস সর্বপ্রথম স্পোর্টসকে 'মিউটেশন' নামে অভিহিত করেন। হল্যান্ডের হ্যালভেরস্ট্রাম-এর নিকটে একটি আলু ক্ষেতে *Oenothera lamarckiana* প্রজাতির আগাছা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি আগাছার প্রতিটি বংশের গাছের উচ্চতা, আকার, পাতার আকৃতি-আকার, ফুল ও ফলের আকারের বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো (random) তারতম্যকে ভিত্তি করে 'মিউটেশন' অনুকল্প গড়ে তোলেন। এরপর ১৯০৮ সালে আমেরিকার কোষবিদ গ্যাট্স উদ্ভিদে 'ট্রান্সলোকেশন' নামক ক্রোমোসোম মিউটেশন চিহ্নিত করেন। ১৯১০ সালে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক টি এইচ মর্গান এবং মর্গানের ছাত্র এইচ জে মুলার *Drosophila melanogaster* প্রজাতির ফলের মাছির চোখে জিনেটিক মিউটেশন আবিষ্কার করেন। তারা এক্স-রে প্রয়োগে কৃত্রিমভাবে পুনরায় জিনেটিক মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম হন। এবং তার কিছু ফিনোটাইপ বা চরিত্র লক্ষণ সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। *E. Coli* নামক ব্যাকটেরিয়া, মানুষ এবং উচ্চতর স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্ত্রের মধ্যে বাস করে। এদের দেহের গঠন ও ক্রিয়া বোঝা তুলনামূলকভাবে সহজ। ল্যাবরেটরির সুনিয়নিয়ন্ত্রত পরিবেশে এই ব্যাকটেরিয়াকে সহজেই চাষ করা যায়। Neurospora নামক এক ধরনের ছত্রাক যা পুরানো পচা পাউরুটির গায়ে দেখা যায়। বহু উর্বরা বলে এদেরও সহজে ল্যাবরেটরিতে চাষ করা যায়। ফলের মাছির প্রজন্মকাল দুই সপ্তাহ, ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার প্রজন্মকাল (বাহির থেকে খাদ্য সরবরাহ করলে) প্রায় ১৫-২০ মিনিট। অল্পসময়ে একটি প্রজাতির সকল প্রাণীর মধ্যে কিংবা একটি প্রজাতির একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিউটেশনের প্রভাব, ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব, পরিবর্তিত পরিবেশে বেঁচে থাকার লড়াই ইত্যাদি বিষয় নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য এই জীবদের বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মানুষ (মানুষের এক প্রজন্মকাল ২৫ বছর) কিংবা যেসব জীবের প্রজন্মকাল খুব দীর্ঘ এবং সীমিত সংখ্যক সন্তান জন্ম দিতে পারে এমন

জীবের উপর স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীদের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভবপর নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ক্রোমোসোম মিউটেশনের ন্যায় জিনেটিক মিউটেশন আবিষ্কার হলে প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশন উদ্ভবের কারণ যে মিউটেশন এবং ডারউইনের উল্লেখিত 'স্পোর্টস' যে আসলে 'জিন মিউটেশন' সে সম্পর্কে নিশ্চিৎ হওয়া যায়। মিউটেশন নিয়ে বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী-গবেষক প্রচুর গবেষণা করেছেন। বংশগতিবিদ্যার বিকাশের সাথে সাথে মিউটেশনের অনেক অজানা তথ্যই আজ   আমাদের সামনে উন্মোচিত। জীববিবর্তনের সাথে বংশগতির সেতু স্থাপন করেছে এই মিউটেশন।

মিউটেশন বা পরিব্যক্তি জীববিবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে একে জীববিবর্তনের 'কাঁচামাল' (raw materials) বলে থাকেন। তবে জীবের সকল মিউটেশনই জীববিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবের দেহকোষে যে মিউটেশন হয়, তা জীবের শুক্রাণু বা ডিম্বাণু বা নিষিক্ত ডিম্বতে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না, পরবর্তী প্রজন্মেও সঞ্চারিত হয় না। জীববিবর্তনের অংশ হতে হলে মিউটেশন জীবের জননকোষে (শুক্রাণু বা ডিম্বাণু বা নিষিক্ত ডিম্বতে) ঘটতে হবে, জীবের বংশধরদের (offspring) মধ্যে সঞ্চারিত হতে হবে। জীববিবর্তনকে একটি প্রজাতির সকল প্রাণীর বা ঐ প্রজাতির একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর (population) জিনসম্ভারের (gene pool) পরিবর্তনের নিরিখে বিবেচনা করা হয়। আর জীববিবর্তন তত্ত্ব কখনোই বলে না-'সকল জীবেরই বিবর্তন হবে'। যদি কোনো জীবের বা গোটা প্রজাতিতে বা জনগোষ্ঠীতে সঠিক মিউটেশন না ঘটে, ভ্যারিয়েশন উৎপন্ন হতে না পারে, পরিবর্তিত পরিবেশে টিকে থাকতে অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করতে না পারে তবে ঐ জীবের বিবর্তন হবে না। উদাহরণস্বরূপ *Streptococcus* নামক ব্যাকটেরিয়ার কথা বলা যায়; এরা শিশুদের গলায় রোগ সংক্রমণের দায়ী। ঐ ব্যাকটেরিয়ার উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে দেখা গেছে এদের মধ্যে পরিবর্তিত পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত

মিউটেশন না ঘটার কারণে তাদের মধ্যে বিবর্তন হচ্ছে না। এমন কী 'ব্যাকটেরিয়া প্রতিষেধক' প্যানিসিলিনের বিপক্ষে খুব সামান্যই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে।

Eukaryotic বা প্রকৃতকোষী জীবে ডিএনএ থাকে ক্রোমোসোমের ভিতর, আর ক্রোমোসোম থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতর। আর Prokaryotic বা আদিকোষী জীবে (ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া) ডিএনএ নিরাবরণ থাকে, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে থাকে শুধু আরএনএ। আদিকোষী জীবের কোষ বিভাজন হয় বাইনারি ফিশন (binary fission) পদ্ধতিতে আর প্রকৃতকোষী জীবের দেহকোষ বিভাজিত হয় মাইটোসিস পদ্ধতিতে এবং জননকোষ বিভাজিত হয় মিয়োসিস পদ্ধতিতে। কোষ বিভাজনের সময় কোষের ভিতরকার উপাদানগুলোর রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপিকরণ হয়। ঐ সময় জীবের ক্রোমোসোম অথবা জিনের হুবুহু প্রতিলিপি তৈরি না হয়ে এদের কোন কোন অংশে আকস্মিক, উদ্দেশ্যহীন-পূর্বপরিকল্পনাহীনভাবে বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো (random) পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে; তাকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলে (accidental changes in the sequence of DNA)। ইংরেজি random (এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত) শব্দটি নিয়ে প্রায়শই ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। random মানে আসলে কি? অনেকেই বলে থাকেন র‍্যান্ডম মানে 'উদ্দেশ্যহীন-পূর্বপরিকল্পনাহীনভাবে যে কোনো কিছু ঘটা।' পুরো ব্যাপারটা আসলে তা নয়। ধরা যাক, 'অনেক লোকই লটারির টিকিট ক্রয় করেছে (আমি বাদে) এবং লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হবে। বিজয়ী লটারির নাম্বার র‍্যান্ডম পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। এর মানে কি এই, উদ্দেশ্যহীন, পূর্বপরিকল্পনাহীন থাকার কারণে যে কেউ লটারির টিকিট জিততে পারে? মানে আমি লটারির টিকিট ক্রয় করি নি, আমারও কি লটারির টিকিট জেতার কোনো সম্ভাবনা আছে?' না। তাহলে এখানে র‍্যান্ডম বলতে কি দাঁড়ালো? সুনির্দিষ্ট সংখ্যক পপুলেশন বা জনগোষ্ঠীর (শুধু যারা লটারির টিকিট ক্রয় করেছে) মধ্য থেকেই কেবল বিজেতা নির্বাচিত হবে; এবং লটারির টিকিট ক্রেতাদের মধ্যে প্রত্যেকের সমান সম্ভাবনা রয়েছে, যে কারো পুরস্কার জেতার। ঠিক তেমনি মিউটেশনকে র‍্যান্ডম বলার অর্থ এই

নয় যে, যে কোনো ধরনের কল্পনাসাধ্য ব্যাপার ঘটার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন-পূর্বপরিকল্পনাহীন জিনেটিক পরিবর্তনের সীমানা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে ডিএনএ'র অনুক্রমের মধ্যে এবং নির্দিষ্ট ডিএনএ অনুক্রমের (sequence) মধ্য থেকেই কেবল কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু কি ঘটবে সে সম্পর্কে পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না (unpredictable)। যখন কোষ বিভাজনের সময় কোনো ক্রোমোসোমের গঠনগত পরিবর্তন হয় অর্থাৎ ক্রোমোসোমের জিন সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, বিন্যাস পরিবর্তন হয়, ক্রোমোসোমের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে-তাকে ক্রোমোসোম মিউটেশন বলে। আর কোন জিন অথবা ডিএনএ'র শৃঙ্খলে যে নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারের (অ্যাডেনিন (A), থাইমিন (T), সাইটোসিন (C), গুয়ানিন (G)) বিন্যাস রয়েছে, তা নতুন করে যুক্ত-বিযুক্ত-বিন্যস্ত হওয়াকে বলে জিনেটিক মিউটেশন।

বিভিন্ন কারণেই মিউটেশন ঘটতে পারে, উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:(ক) কোষ বিভাজনের সময় ডিএনএ যদি তার প্রতিলিপি হুবুহু নকল তৈরি করতে না পারে। প্রাকৃতিকভাবেই এই ঘটনা ঘটে থাকে। নিউ ইয়র্কের কার্নেগি ইনস্টিটিউশনের প্রজননবিদ মিনিস্লাভ ডিমেরেক-এর *E. coli* জীবাণু নিয়ে গবেষণা হতে জানা গেছে, প্রাকৃতিকভাবে ঘটা মিউটেশনে পরিবেশ নিজে কোনো মিউটেশন ঘটায় না। পরিবেশ শুধু বিভিন্ন ধরনের মিউট্যান্ট থেকে উপযুক্ত মিউট্যান্টকে বেছে নেয়। (খ) গবেষণাগারে বাহ্যিক কিছু প্রভাবকের দ্বারা মিউটেশন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বা উচ্চমাত্রার রেডিয়েশনের ফলে অনেক সময় জীবের ডিএনএ'র সিকোয়েন্সে পরিবর্তন আসতে পারে অথবা ডিএনএ'র গঠন ভেঙ্গে যেতে পারে। বিষয়টি অপ্রাকৃতিক কিছু নয়। ডিএনএ ভেঙ্গে গেলে জীবকোষের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় ডিএনএ মেরামত হয়, কিন্তু পুরোপুরি মেরামত হয় না বা ভেঙ্গে যাওয়া ডিএনএ'কে হুবুহু পূর্বের মত হয় না, কিছুটা পরিবর্তন থাকে। ডিএনএ সিকোয়েন্সে বা ডিএনএ'র গঠনের এই পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে।

মিউটেশনের অনেকগুলো ধরন বা প্রকার রয়েছে। মিউটেশনের কিছু প্রাথমিক ধরন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

(ক) প্রতিস্থাপন (Substitution): ডিএনএ'র মধ্যে যে চারটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষার (অ্যাডেনিন (A), থাইমিন (T), সাইটোসিন (C), গুয়ানিন (G)) রয়েছে, তারা পরস্পরের সাথে 'পাঁকানো দড়ির মত' (যুগ্ম সর্পিল) হাইড্রোজেন বন্ধনে আবদ্ধ। Substitution এমন ধরনের মিউটেশন যেখানে ডিএনএ'র একটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারের অবস্থানের স্থলে আরেকটি নাইট্রোজেন ঘটিত ক্ষারের বদল হয়।

CTGGAG
CTGGGG

এ ধরনের মিউটেশনের ফলে একটি পৃথক অ্যামাইনো এসিডের উদ্ভব হয়, কিন্তু অনেক সময় প্রোটিনের কাজে খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ সিকল সেল অ্যানেমিয়া (রক্তস্বল্পতা) রোগের জন্য দায়ী বিটা-হিমোগ্লোবিন জিনের মিউটেশনটার ধরন হচ্ছে Substitution, যার ফলে একটি মাত্র অ্যামাইনো এসিডের পরিবর্তন ঘটে। Substitution মিউটেশনের ফলে অনেক সময় একটি মাত্র কোডনের পরিবর্তন হলেও অ্যামাইনো এসিডের পরিবর্তন হয় না, প্রোটিনের কার্যাবলীতেও পরিবর্তন আসে না। যাকে নীরব (silent) মিউটেশন বলে। আবার একটি মাত্র অ্যামাইনো এসিডের পরিবর্তন হলে অনেক সময় অসম্পূর্ণ প্রোটিনের উদ্ভব হয়, ফলে প্রোটিনের কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

(খ) সন্নিবেশন (Insertion): মিউটেশনের ফলে যদি ডিএনএ'র অনুক্রমের কোনো স্থানে যদি হঠাৎ করে আকস্মিকভাবে কমপক্ষে অতিরিক্ত এক জোড়া বেস ঢুকে যায় তাকে সন্নিবেশন বা Insertion বলে। নীচের চিত্র থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

(গ) বিলোপন (Deletion): নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটি কোন ধরনের মিউটেশন। মিউটেশনের ফলে অনেক সময় ডিএনএ'র কোনো অংশ হঠাৎ বিলুপ্ত বা চ্যুত হয়ে যেতে পারে। কমপক্ষে যদি এক জোড়া বেস বা ক্ষার ডিএনএ অনুক্রম থেকে মুছে যায়, তাকে বিলোপন (Deletion) মিউটেশন বলে থাকে।

CTGGAG

CTAG

(ঘ) ফ্রেমশিফট (Frameshift): জীবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রোটিনের সাংকেতিক লিপি হল 'জিন' (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিএনএ'তে অবস্থিত, কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে আরএনএ'তে); যা জীবের বংশগতির একক। একেকটি 'জিন' একেকটি প্রোটিনের সাংকেতিক লিপি। কয়েকটি 'কোডন' মিলে জিন গঠিত। কোডন হচ্ছে তিনটি নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষার (base)-এর মিলিত রূপ; যেমন ATC কিংবা CGA। একেকটি কোডন (উদাহরণস্বরূপATC কিংবা CGA) একটি অ্যামাইনো এসিডের সাংকেতিক লিপি। ডিএনএ অনুক্রমে সন্নিবেশন (Insertion) বা বিলোপন (Deletion) ঘটলে কোডনের গঠনে পরিবর্তন ঘটে এবং এতে জিনের নির্দিষ্ট কার্যক্রমেরও বদল ঘটে। জিনের পরিবর্তন হলে পৃথক প্রোটিনের উদ্ভব হয়। একে ফ্রেমশিফট মিউটেশন বলে।

The fat cat sat

hef atc ats at

বিষয়টি বোঝার জন্য ইংরেজি একটি বাক্য ধরা যাক: The fat cat sat । মোটামুটি অর্থবোধক এই বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ একেকটি কোডন। এখন যদি আমরা বাক্যের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর মুছে ফেলি এবং তিনটি অক্ষর মিলিয়ে শব্দগুলি পড়ার চেষ্টা করি, তবে এই বাক্যের আর কোনো অর্থ প্রকাশ পায় না, 'hef atc ats at' । ফ্রেমশিফট মিউটেশন হলে একই ধরনের ঘটনা ঘটে ডিএনএ লেভেলে। কোডনের গঠন পরিবর্তনে জিনের কার্যক্রম অকার্যকর হয়, অর্থহীন হয়ে যায়।(১২)

মিউটেশনের উপরোক্ত ধরনগুলির বাইরেও আরো কিছু ধরনের মিউটেশন রয়েছে, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি বিবেচনায় এখানে ক্ষান্ত দিতে হচ্ছে।

প্রতি মুহূর্তেই যৌনপ্রজননশীল জীবের দেহকোষ, জননকোষ বিভাজিত হয়। কোনো যৌনপ্রজননশীল জীবের দেহকোষে (চামড়া, মাংসপেশী, লিভার টিস্যু ইত্যাদি) 'মাইটোসিস' প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের সময় যে মিউটেশন ঘটে থাকে, তা ঐ জীবেই প্রকাশিত হয়; পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয় না। ফলে দেহকোষের মিউটেশনটি জীববিবর্তনের অংশ হতে পারে না। ঐ জীবটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিউটেন্ট জিনটিও লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন জীবের দেহকোষে মিউটেশনের ফলে অনেক সময় দেহকোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির ফলে টিউমার হয়ে থাকে। এই টিউমার বা ঐ দেহকোষের মিউটেশন পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত নাও হতে পারে।

শুধুমাত্র জীবের জননকোষে (শুক্র অথবা ডিম্বতে) 'মিয়োসিস' প্রক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের সময় যে মিউটেশন ঘটে থাকে, তাই বংশপরম্পরায় (পরবর্তী প্রজন্মে) প্রবাহিত হয়। মিউটেশন হলে জীবদেহের অ্যামাইনো এসিডের বদল ঘটে এবং এর দ্বারা প্রোটিনের (অনেকগুলি অ্যামাইনো এসিড নিয়ে গঠিত জটিল জৈবযৌগ) কাজ করার ক্ষমতা বদল হয়ে যায়। জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকা বিশাল। কিছু প্রোটিন জীবের বিভিন্ন অঙ্গের গঠনে সহায়তা করে, যেমন কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, রাইবোজোম, স্নায়ু, পেশিতন্তু ইত্যাদি; কিছু প্রোটিন এনজাইম বা উৎসেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। রক্ত এবং রক্তরসেও রয়েছে প্রোটিন যেমন গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, ফাইব্রোজেন। কিছু প্রোটিন আবার হরমোন, যেমন ইনসুলিন। বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধের জন্য শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে প্রোটিন। এছাড়া বিশেষ অবস্থায় (দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে) শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়ায়ও অংশ নিয়ে থাকে প্রোটিন। মিউটেশনের ফলে প্রোটিনের কার্যকারিতা বদল হয়ে গেলে যেমন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াও বদল হয়ে যায়, তেমনি কোষ-কলার গঠনেও বদল চলে আসে। এভাবে ক্রোমোসোম বা জিনেটিক

মিউটেশনের ফলে একই প্রজাতির বিভিন্ন জীবে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত বিভিন্নতা (ভ্যারিয়েশন, প্রকরণ) দেখা দেয়। ঠিক কতখানি প্রোটিনের কাজ করার ক্ষমতা বদল হল, তা নির্ভর করে মিউটেশনের ফলে কি পরিমাণ অ্যামাইনো এসিডের বদল হল, তার উপর।

মিউটেশন বা পরিব্যক্তি নিয়ে একটি প্রচলিত সাবেকী ধারণা হল-'বেশিরভাগ মিউটেশন-ই ক্ষতিকর'। কিন্তু মিউটেশন নিয়ে আধুনিক গবেষণা হতে জানা গেছে, আসলে বেশিরভাগ মিউটেশন-ই নিরপেক্ষ (neutral) অথবা নিরব (silent)। অনেক সময় মিউটেশনের ফলে ডিএনএ'র সিকোয়েন্স পরিবর্তন হয়, কিন্ত তা অ্যামাইনো এসিডে কোনো প্রভাব ফেলে না, অথবা মিউটেশনের ফলে অ্যামাইনো এসিডেও পরিবর্তন এলো কিন্তু তা প্রোটিনের সামগ্রিক কাজে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, এ ধরনের নিরব মিউটেশন প্রকৃতিতে প্রায়শই ঘটে থাকে।

মিউটেশন জীবের জন্য ক্ষতিকর না উপকারী, তা অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ জীব যে পরিবেশে বাস করে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। পরিবেশ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। আজ যে পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে কোন মিউটেশনকে জীবের জন্য 'উপকারী মিউটেশন' মনে হতে পারে, কিছুদিন পরই এই পরিবেশের পরিবর্তন হয়ে গেলে আগের মিউটেশনটাই প্রকৃতিতে জীবের টিকে থাকার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই মিউটেশনকে 'সাধারণীকরণ' করে বলা জটিল বটে। তারপরও কোন মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো (Variation) যদি জীবকে প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত সুবিধা লাভে সহায়তা করে, তাকে জীববিজ্ঞানীরা 'উপকারী মিউটেশন' নামে অভিহিত করে থাকেন আর বিপরীতটা যদি ঘটে (অর্থাৎ এই পরিবর্তনের ফলে এমন হয় যদি জীবদেহে রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে সহজে, কিংবা জীবের প্রকৃতিতে টিকে থাকা দায় হয়ে যায়), তাকে 'ক্ষতিকর মিউটেশন' নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে: নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ মিউটেশনের উদাহরণ হচ্ছে: ধরা যাক, কোন শিশুর জন্মের সময় (বাবা-

মায়ের শুক্রাণু-ডিম্বাণুর মিলনকালে) মিউটেশনের ফলে বাবা-মার বাদামী বা গাঢ় খয়েরী রঙের চোখ থেকে অনেক হাল্কা রঙের চোখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। যদি ঐ শিশু তার জীবনে এই মিউটেশনের ফলে প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত কোন সুবিধা (দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি) পায় না বা কোন ক্ষতির সম্মুখীন (দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ) হয় না, তাহলে বলতে হবে, ওটা নিরপেক্ষ মিউটেশন ছিল; যা ঐ শিশুর দেহে শুধু একটি প্রকরণ বা Variation তৈরি করেছে।

ইতিবাচক বা উপকারী মিউটেশনের উদাহরণ হতে পারে ‘এইচআইভি ভাইরাস’। এইডস রোগীদের জন্য কোন কার্যকরী ঔষধ এখনও তৈরি করা যাচ্ছে না, কারণ ঔষধ প্রয়োগ করার সাথে সাথে এইচআইভি ভাইরাসগুলো নিজেদের মধ্যে দ্রুত মিউটেশন ঘটিয়ে ঔষধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ঔষধ আর কার্যকরী হতে পারে না। মানুষের জন্য এটা ক্ষতিকর মনে হলেও এই মিউটেশন ভাইরাসগুলোর জন্য ‘উপকারী’ বলা যায়, কারণ এর ফলে ভাইরাসগুলো প্রকৃতিতে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। আবার অনেক সময় মানবদেহে CCR5 জিনের মিউটেশন এইচআইভি জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে; উক্ত জিনেটিক মিউটেশনের ফলে এইচআইভি জীবাণু দেহে কার্যকর হতে পারে না। এটাও ‘উপকারী’ বা ‘ইতিবাচক’ মিউটেশনের উদাহরণ। আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ‘সিকল সেল অ্যানেমিয়া’ (sickle cell anemia) নামক রক্তস্বল্পতার বংশগত রোগ বহুদিন ধরেই মানবশরীরে ক্রিয়াশীল। এই রোগটা রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে (red blood cells) আক্রমণ করে। লোহিত কণিকার মধ্যে রয়েছে হিমোগ্লোবিন, যার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে যায়। হিমোগ্লোবিন শব্দের হিম লোহার একটি যৌগ আর গ্লোবিন হল এক ধরনের প্রোটিন। অক্সিজেনযুক্ত অক্সিহিমোগ্লোবিনের জন্যই রক্তের রঙ লাল দেখায়। জিনেটিক মিউটেশনের কারণে হিমোগ্লোবিনের প্রোটিনের কার্যকারিতা বদলের কারণে সিকল সেল অ্যানেমিয়া রোগের উদ্ভব। সাধারণ অবস্থায় লোহিত কণিকা দেখতে গোলাকার চাকতির মত হলেও সিকল সেল অ্যানেমিয়ায়

আক্রান্ত হলে লোহিত কণিকার আকৃতি কাস্তের মত বাঁকা হয়ে যায়। তখন আক্রান্ত কণিকা ছোট ছোট রক্তনালীকার মুখে আটকে যায়, অক্সিজেনও শরীরের সব জায়গায় পৌঁছতে পারে না; এবং শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্বেত কণিকা (white blood cells)) আক্রান্ত লোহিত রক্তকোষগুলোকে মারতে শুরু করে। ফলে মানব শরীরে দেখা দেয় রক্তস্বল্পতা। যে জিনেটিক মিউটেশন 'সিকল সেল অ্যানেমিয়া' (রক্তস্বল্পতা) রোগের জন্য দায়ী, মানব শরীরের জন্য তারও অবশ্য একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে : দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রতিরোধে 'সিকল সেল অ্যানিমিয়া' বহনকারী হিমোগ্লোবিন বেশি কার্যকরী; অর্থাৎ 'রক্তস্বল্পতা রোগহীন' ব্যক্তির শরীর ম্যালেরিয়ার জীবাণু বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত-সহায়ক হলেও রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠে। ফলে রক্তস্বল্পতা রোগহীন ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পরিমাণ রক্তস্বল্পতায় আক্রান্ত ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি।

অনেক নারীর BRCA1 এবং BRCA2 জিন দুটির মিউটেশনের ফলে স্তন ক্যান্সার (breast cancer) হয়ে থাকে, যা পরবর্তীতে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ঐ জিন মিউটেশনকে স্বাভাবিকভাবেই 'ক্ষতিকর মিউটেশন' বলা যায়। তাছাড়া CFTR জিনে মিউটেশনের ফলে উদ্ভূত শ্বাসকষ্ট এবং ফুসফুস সংক্রমণের এক ধরনের দূরারোগ্য বংশগত রোগ cystic fibrosis, হান্টিংটং (Huntington) রোগ, ডায়াবেটিস, মানসিক রোগ যেমন সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার (Bipolar) রোগের জন্য দায়ী জিনেটিক মিউটেশন 'ক্ষতিকর' মিউটেশনের উদাহরণ।

মিউটেশন নিয়ে আরো একটি প্রচলিত ধারণা হল 'মিউটেশন জীবজগতে খুব দুর্লভ একটি বিষয়।' জীবজগতে প্রাকৃতিকভাবে বড় বড় স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশন বেশ ধীরে ঘটলেও, ছোটখাট মিউটেশন প্রায়ই ঘটে, এগুলো দুর্লভ কোনো ঘটনা নয়। আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোটখাট মিউটেশন হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা প্রকৃতি না থাকায়

তা প্রকাশিত হয় না। ভাইরাসের উপর পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা যায়, মোটামুটিভাবে ভাইরাসের প্রতি জিনোম রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপিকরণের সময় ০.১ থেকে ১টি মিউটেশন ঘটে থাকে এবং অণুজীবদের ক্ষেত্রে প্রতি জিনোম রেপ্লিকেশনের সময় ০.০০৩ টি মিউটেশন ঘটে। খুব কম করে হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, মানুষের প্রতি প্রজন্মে মিউটেশনের হার ১.৬। এই হিসাবে নিরপেক্ষ মিউটেশন কিংবা ছোট ছোট মিউটেশন গণনা করা হয় নি। নিরপেক্ষ মিউটেশনসহ গণনা করে দেখা গেছে, শুধুমাত্র মানবভ্রুণেই ৬৪টি নতুন মিউটেশন হয়ে থাকে।(৩) আরেক হিসাবে, মানুষের প্রতি প্রজন্মে মিউটেশনের হার ১৭৫, এর মধ্যে কমপক্ষে তিনটি ক্ষতিকারক মিউটেশন।(৪)

মিউটেশনের হার স্থির কিছু নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে মিউটেশন ঘটার পাশপাশি কৃত্রিম পদ্ধতিতেও জীবদেহে মিউটেশন ঘটানো যায়। এক্স-রশ্মি, গামা রশ্মি, বিটা রশ্মি, দ্রুতগামী নিউট্রন ও প্রোটন ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত পরিব্যক্তিকর বা mutagen। এছাড়া রয়েছে অতি-বেগুনী রশ্মি, Radio-mimicking নামক রাসায়নিক মিউটাজেন; ডিএনএ ও আরএনএ জাতীয় ভাইরাস যথা স্যানডাই, মিসেল্স বা হাম, পীত জ্বর, হার্পিস, সংক্রামক হেপাটাইটিস, পোলিও-মাইয়েলিটিস, এডিনো ভাইরাস, *Mycoplasma* প্রভৃতি জৈব মিউটাজেন। উপরোক্ত প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ফ্যাক্টর দ্বারা মিউটেশনের হার বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার হলেও এর দ্বারা কোনোভাবেই মিউটেশনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় না। এমন কী, জীবের চাহিদার উপর নির্ভর করেও মিউটেশন হয়। মিউটেশন নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষণের (উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৫২ সালের Esther এবং Joshua Lederberg -এর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা) মাধ্যমে নিশ্চিৎ হওয়া গেছে মিউটেশন র‍্যান্ডমভাবেই ঘটে, পরিবেশ বা অন্যকিছু দ্বারা নির্দেশিত হয় না। ধরা যাক অতি-বেগুনী রশ্মি প্রয়োগ করে কোনো জীবদেহে মিউটেশন হার বৃদ্ধি করা হল, কিন্তু এই মিউটেশনগুলোর ফলে জীবদেহে জীবাণু প্রতিরোধকারী ভাল জিনের উদ্ভব হবে কিনা, কিংবা কোনো

ক্ষতিকর জিনের উদ্ভব হবে কিনা, সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা (direction) বা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না (unpredictable)। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়, মিউটেশন র‍্যান্ডম বা বিক্ষিপ্তভাবে ঘটে।

অবশেষে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে জীবজগতে কেন মিউটেশন ঘটে, কেনইবা ভ্যারিয়েশন হয়? সহজভাবে বলতে গেলে জীবজগতে মিউটেশন বা ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব একটি নিরেট বাস্তবতা। আমরা জানি কোনো জীবই তার বংশগতির তথ্য হুবুহু একই রকম প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে না। যদি সে এটা করে ফেলে কখনো বিবর্তনের দৃষ্টিতে সেই জীবের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়। হুবুহু ডিএনএ প্রতিলিপি বা নকল তৈরি করা মানে ঐ জীবকে প্রকারন্তরে পঙ্গু করে ফেলা। নতুন প্রতিযোগীর সাথে প্রতিযোগিতায় অথবা পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটাতে অক্ষম হয়ে যায়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালিত বিবর্তন সেই জীবের পক্ষেই যায়, যে জীব সহজেই পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। তার মানে আমরা বলতে পারি 'একটা জিনের অর্থ আসে তার পরিবর্তন থেকে। যেমন একটা চোখের রঙের জিনের দুটো রূপ, কালো চোখ ও নীল চোখ সৃষ্টি করে। পৃথিবীর প্রতিটি লোকের চোখ যদি কালো হয়, যদি সে জিন কিছুতেই না বদলায় তবে নীল চোখের লোক পৃথিবীতে জন্মাবে না, আর আমরাও জানতে পারব না যে সে জিন আসলে চোখের রঙ সৃষ্টি করে। একটা ডিএনএ সিকোয়েন্সের মানে আসে সে জিনের মিউটেশনের ফলে জীবজগতে সৃষ্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে। পৃথিবীর ও বিভিন্নতাই আসলে সৃষ্টির গূঢ় মানে। অভিন্ন, একক জীবন অর্থহীন ও স্থবির। জগতের বৈচিত্র্যের ছোঁয়াই জিনোম অর্থবহ হয়।'(৫)

উৎসনির্দেশঃ

(১) ম্যান্ডেলের গবেষণা নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশকিছু ভাল বই রয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ম. আখতারুজ্জামান, বংশগতিবিদ্যা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা; নারায়ন সেন, ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চারশো কোটি বছর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

(২) মিউটেশনের ধরন সম্পর্কে উপরোক্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে পাশের ওয়েব সাইট থেকে: http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/IIIC3aTypes.shtml
(৩) John W. Drakea, Brian Charlesworthb, Deborah Charlesworthb, and James F. Crowc, Rates of Spontaneous Mutation, Genetics, Vol. 148, 1667-1686, April 1998, http://www.genetics.org/cgi/content/full/148/4/1667
(৪) Michael W. Nachmana and Susan L. Crowella, Estimate of the Mutation Rate per Nucleotide in Humans, Genetics, Vol. 156, 297-304, September 2000, http://www.genetics.org/cgi/content/full/156/1/297
(৫) আবেদ চৌধুরী, মানব জিনোম : মানুষের জিন, জিনের মানুষ, ২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৩।

অতিরিক্ত পাঠঃ

১) আবেদ চৌধুরী, মানবজিনোম: মানুষের জিন, জিনের মানুষ, ২০০২, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
২) দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, প্রাণ ও অপ্রাণের সীমান্তে, ১৯৯২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৩) The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy) (2003). “Are Mutations Harmful?” by Richard Harter, from http://www.talkorigins.org/faqs/mutations.html

ঈশ্বর-বিশ্বাস বনাম জীববিবর্তন পাঠ

মানুষ কেন ধর্ম-ঈশ্বরে বিশ্বাস করে কিংবা ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কিত মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণগুলি মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়। মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস নির্ভর করে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর। বিজ্ঞানের কোনো শাখাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হয় না; এটা দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। তবে, ঈশ্বরের বিশ্বাস কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস কবে-কিভাবে মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল এ নিয়ে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান। আর জীববিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব জীববিবর্তনের আলোচ্য বিষয় প্রজাতির উদ্ভব, বিকাশ, প্রকরণ, অভিযোজন ইত্যাদি। জীববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে 'নাস্তিকতা' প্রচারে অভিযোগ এই তত্ত্বের জন্মকাল থেকেই; অভিযোগ রয়েছে এই তত্ত্ব মানুষকে জীবজগতে ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করে তোলে। অথচ পৃথিবীতে যেভাবেই জীবনের উৎপত্তি ঘটুক না কেন, এরপর সেটি কী করে পদে পদে বিকশিত হল, উদ্ভব ঘটল বৈচিত্র্যের, নতুন নতুন প্রজাতির, এগুলোই জীববিবর্তনের আলোচনার বিষয়বস্তু। পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে কাজ করে জৈব-রসায়ন (Bio-Chemistry), ভূ-রসায়ন (Geo-Chemistry)(১)। প্রাণের উৎপত্তির বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে প্রাণ-রাসায়ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বির্তক থাকলেও বিজ্ঞানের ঐসব শাখার কোথাও 'ঈশ্বর কর্তৃক প্রাণ সৃষ্টি'-কে অনুকল্প (Hypothesis) হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। (বিজ্ঞান কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলে 'অতিলৌকিক' কোনো ধারণা যেমন ঈশ্বরকে, মেনে নিতে হবে, এমনটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়) বরঞ্চ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন 'পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভবের আগে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব-

রাসায়নিক উপাদানগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেই। উপযুক্ত শক্তির উৎস (Energy source), রাসায়নিক উপাদানসমূহ (Chemicals), উপযুক্ত দ্রাবক (Solvent), উপযুক্ত তাপমাত্রা, একটি বিজারক বায়ুমণ্ডল (Reducing) ইত্যাদির সহাবস্থান তিনশ' কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ছিল। অতএব এ সময় জৈবযৌগ এবং জীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব ছিল।' (দ্রষ্টব্য: মনিরুল ইসলাম, জীববিবর্তনবাদ: দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮)।

ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রকাশের পর গত দেড়শ' বছরের ইতিহাসে বহু ধার্মিক-ঈশ্বর বিশ্বাসী বিজ্ঞানী জীববিবর্তনকে বাস্তব বলে মেনে নিয়েছেন, ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বকে গবেষণাগারে, গবেষণাগারের বাইরে প্রমাণ করেছেন। নিজেদের ডারউইনবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। জীববিবর্তন তত্ত্ব কখনোই তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস-ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়নি। নিজেদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অভিরুচি, ধর্মীয় পরিচয় কখনোই বিজ্ঞানের প্রতি তাদের নিষ্ঠা, ঐকান্তিক ভালোবাসা, বিজ্ঞানমনস্কতার উপর চেপে বসতে পারেনি। উদাহরণ হিসেবে নাম উল্লেখ করা যায়, পপুলেশন জেনেটিক্স (জনপুঞ্জ বংশগতিবিদ্যা) এবং পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রবক্তা স্যার রোনাল্ড ফিশারের (Sir Ronald Aylmer Fisher, 1890-1962) নাম। যিনি একাধারে কট্টর ডারউইনবাদী, পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী, নিয়মিত ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখেছেন চার্চের ম্যাগাজিনগুলোতে। থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি (Theodosius Dobzhansky, 1900-1975) বিশ্বের খ্যাতনামা বিবর্তন তাত্ত্বিক। ডবঝানস্কি সারা জীবন রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের সদস্য ছিলেন, একই সাথে মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রের সাথে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের সংযোগ সেতু তৈরি করেন বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্বের (The Modern Synthesis Theory of Evolution) মধ্য দিয়ে, ডারউইন তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা দূর করেন। ১৯৩৭ সালে ডবঝানস্কির সেই বিখ্যাত গ্রন্থ 'Genetics and the Origin of Species' প্রকাশের

পর জীববিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে জীববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে সকল সংশয় দূর হয়। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের শিরোনাম 'জীববিবর্তনের বোধ ব্যতীত জীববিজ্ঞানে কোন কিছুই অর্থবোধক নয়' (Nothing in Biology Makes any Sense Except in the Light of Evolution) এখনো জীববিবর্তন তত্ত্বের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মুখে মুখে ফিরে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেন:

"It is wrong to hold creation and evolution as mutually exclusive alternatives. I am a Creationist and an Evolutionist. Evolution is God's, or Nature's method of creation. Creation is not an event that happened in 4004 BC; it is a process that began some 10 billion years ago and is still under way."(২)

মানব-জিনোম প্রকল্পের প্রাক্তন পরিচালক ফ্রান্সিস কলিন্স (Francis Collins) জীববিবর্তন তত্ত্বের সমর্থক, একই সাথে খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসী। জীববিবর্তন পাঠে বা গবেষণায় কখনোই ফ্রান্সিসের ধর্মীয় বিশ্বাস অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি যেমন জীববিবর্তনকে 'বাস্তব' বলে মেনে নিয়েছেন, ডারউইনের তত্ত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন গবেষণার সাহায্যে, একই সাথে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস অটুট আছে কোনো ধরনের সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই। কলিন্স লিখেছেন:

"Many People who have considered all the scientific and spiritual evidence still see God's creative and guiding hand at work. For me, there is not a shred of disappointment or disillusionment in these discoveries about the nature of life-quite the contrary! How marvelous and intricate life turns out to be! How deeply satisfying is the digital elegance of DNA! How aesthetically appealing and artistically sublime are the components of living things, from the

ribosome that translates RNA into protein, to the metamorphosis of the caterpillar into butterfly, to the fabulous plumage of the peacock attracting his mate! Evolution, as a mechanism, can be and must true. But that says nothing about the nature of its author. For those who believe in God, there are reasons now to be more in awe, not less.”(৩)

রোনাল্ড ফিশার, ডবঝানস্কি, কিংবা ফ্রান্সিস কলিন্সই শুধু নন, গত দেড়শ’ বছরে ধর্মের প্রতি আস্থাশীল অনেক জীববিজ্ঞানই ডারউইন তত্ত্বের ভিত মজবুত করেছেন নিজেদের বৈজ্ঞানিক পেশাদারিত্ব আর বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা থেকে। আমরা উল্লেখ করতে পারি, আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক Kennth R. Miller -এর কথা। অধ্যাপক মিলার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মবিশ্বাসী হলেও ২০০৫ সালে পেনসিলভানিয়া রাজ্যের Kitzmiller et al. v. Dover Area School District মামলায় জীববিবর্তন তত্ত্বের পক্ষের সাক্ষী ছিলেন। জীববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে যারা একটু খোঁজখবর রাখেন, তারা জানেন পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষ করে আমেরিকাতে সংঘবদ্ধ ডানপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো কিরকম মরিয়া হয়ে জীববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে ওঠেপড়ে লেগেছে। দেড়শ’ বছরে বিভিন্ন ধরনের অসিলা নিয়ে হাজির হলেও সমসাময়িককালে তারা পূর্বতন কৌশল পরিবর্তন করে ‘বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা’ (intelligent design) নাম দিয়ে বিজ্ঞানের মোড়কে অপবিজ্ঞানকে কুৎসিৎ পন্থায় উপস্থাপন করতে চাচ্ছে। আশার কথা এই যে, সংঘবদ্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর এ অপচেষ্টা রুখে দিতে ইতিমধ্যেই পশ্চিমা বিজ্ঞান সমাজ ধর্মবিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে একজোট হয়েছেন, এমনটা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। যে বিজ্ঞানীরা একসময় সমাজজীবন থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়েই নিজের গবেষণাগারে ব্যস্ত সময় কাটাতেন, এখন সেই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পাবলিক ফোরামে, গণমাধ্যমে হাজির হয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, লেকচার দিচ্ছেন, প্রেস কনফারেন্স করছেন,

পত্রিকায় কলাম লিখছেন। জীববিবর্তনকে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য বিজ্ঞানের জটিল পরিভাষা যতটা সম্ভব এড়িয়ে বই লিখছেন। অধ্যাপক মিলারের এরকম দুটি বেস্ট সেলার বইয়ের নাম হচ্ছে: Only A Theory: Evolution and the Battle for America's Soul এবং Finding Darwin's God: A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution। উক্ত গ্রন্থ দুটিতে মিলার ধর্মবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা না করে জীববিবর্তনের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন-প্রবক্তাদের মুখতোড় জবাব দিয়েছেন। মিলার ছাড়াও ব্রিগহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন, অধ্যাপক Daniel J. Fairbanks -ও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু তাঁর Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in Human DNA শিরোনামে শুধুমাত্র 'মানব-জিনোম প্রকল্পের' ডিএনএ গবেষণার ফলাফল নিয়ে রচিত বইটি মানব-বিবর্তনের উপর লেখা এক মাইলস্টোন বলা চলে। এরকম উদাহরণ ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ করা যায়। মূল কথা হচ্ছে, 'জীববিবর্তন তত্ত্ব আক্ষরিক অর্থে ধর্মের বিরোধিতা করছে না। নিশ্চিৎভাবে এটি হয়তো ইহুদি-খ্রিস্টানদের ওল্ডটেস্টামেন্টের জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্যকে অস্বীকার করছে, কিন্তু আধুনিককালে ডবঝানস্কি'র মত অনেক ধর্মবিশ্বাসী বিজ্ঞানীই জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে মেনে নিতে রাজি নন; তারা মনে করেন ১৬৫৪ সালে আইরিশ ধর্মযাজক জেমস আসার (James Ussher, 1581-1656)) ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্টির যে হিসাব (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সাল, রবিবার, সকাল নয় ঘটিকায়) প্রদান করেছেন তা অভ্রান্ত নয়। তারা মনে করেন, বাইবেলের এই অধ্যায়ের ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে; ঈশ্বর ছয় দিনে নয়, বহু কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারাই জগৎ-জীবন সৃষ্টি করেছেন।' অর্থাৎ ঈশ্বরকে জগতের 'আদি কারণ' হিসেবে স্বীকার করেও জীবজগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা বস্তুগত ব্যাখ্যা তারা স্বীকার করে নিচ্ছেন। (আরো দেখুন: http://www.talkorigins.org/faqs/faq-god.html)। ১৯৯৬ সালে খ্রিস্ট ধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ জন পল-২ এক বিবৃতিতে বলেছেন: 'no opposition between evolution and the doctrine

of the faith about man and his vocation, on condition that one did not lose sight of several indisputable points.' (দ্রষ্টব্য: John Paul II, "Message to the Pontifical Academy of Sciences, The Quarterly Review of Biology, Vol. 72, No. 4 (December 1997), pp. 382–383.)। ইদানীং বিজ্ঞানীরা ছাড়াও খ্রিস্ট ধর্মের অনেক নেতা, ধর্মীয় সংগঠন, খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও এগিয়ে এসেছেন 'জীববিবর্তন' তত্ত্বের প্রতি তাতে তাদের সমর্থন জানাতে। বিস্তারিত জানতে দেখুন: Carrie Sager, Voices for Evolution, National Center for Science Education, Inc 2008। পরিষ্কার বুঝা যায়, জীববিবর্তনের প্রমাণ মোটেই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কোনো হুমকি হয়ে দাঁড়ায় নি।

জীববিবর্তন তত্ত্বের জনক হিসেবে পরিচিত চার্লস ডারউইন নিয়েও রয়েছে কট্টর ধর্মান্ধ আর অবিশ্বাসী দলের মধ্যে টানাটানি। এক পক্ষ যেমন তাকে নিবিড়ভাবে বিশ্বাসী খ্রিস্টান বানাতে চায়, অন্যপক্ষও তাকে 'নিরীশ্বরবাদী' বানাতে ব্যস্ত। কিন্তু ডারউইন খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসী কিংবা নিরীশ্বরবাদী যাই হোন না কেন, এর দ্বারা জৈববির্তন তত্ত্বের কোনো কিছু প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয় না। জীববিবর্তন ব্যক্তিগত আবেগ-বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি; বরঞ্চ বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। তারপরও কথা থেকে যায়। পাঠকমনের কৌতূহল নিবারণের জন্য এ বির্তকের ইতি টানা জরুরি। ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর অরিজিন অব স্পিসিজ প্রকাশের পর মানুষের চিন্তার জগতে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার দিকে খ্রিস্ট ধর্মতাত্ত্বিক-বিশপ, গবেষক, বিজ্ঞানী, লেখকগোষ্ঠীর তরফ হতে নির্বিশেষে অজস্র প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়; এবং আজ অবধি তা অব্যহত আছে। বিজ্ঞানের আর কোন তত্ত্ব নিয়ে ডানপন্থী ধর্মীয়গোষ্ঠীর এত দীর্ঘসময় ধরে নিরবিচ্ছিন্ন বিরোধিতা, বিদ্বেষ দেখা যায় নি। ডারউইনের দিকে ধর্মবিরোধিতার অঙ্গুলি ওঠে, কেউবা বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাবি জানান, কেউবা পাল্টা যুক্তি হাজির করে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রপঞ্চকে ভ্রান্ত প্রমাণের চেষ্টা করেন। সেসময় তার

কাছের লোক বলে পরিচিত চার্লস লায়েল, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন স্টিভেন্স হেনস্লো, ভূতত্ত্বের অধ্যাপক অ্যাডাম সেজউইক, ডাল্টন, হুকার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেননি। তবে শুরু থেকেই ডারউইন ধর্মবিরোধিতার অভিযোগের ব্যাপারে মৌননীতি অবলম্বন করেন; ধর্মের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এমন কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। যতটা সম্ভব বির্তক এড়িয়ে তিনি শুধু 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু কিছু চিঠির জবাব দিতেন। অরিজিন অব স্পিসিজ-এর পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার কিছু সংক্ষিপ্ত জবাবও দিয়েছেন। এটা সত্যি, ঐ সময় তার তত্ত্বে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, বিশেষ করে বংশগতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় জীবদেহে প্রকরণ উদ্ভবের প্রক্রিয়া তিনি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। ১৮৫৯ সালের প্রথম সংস্করণের পর ১৮৬০ সালের (৭ জানুয়ারি) দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৬১, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৬৬, পঞ্চম সংস্করণ ১৮৬৯, ষষ্ঠ সংস্করণে (১৮৭২) পাঠকের প্রতিক্রিয়ার জবাব, মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন করেছেন, কিছু কিছু জায়গায় নতুন বক্তব্য-বাক্য যোগ করেছিলেন যা তার বইয়ের প্রথম সংস্করণে ছিল না। এ কাজটি করতে গিয়ে ডারউইন ১৮৬০ সালের দিক থেকেই দুঃখজনকভাবে নিজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় ধরে রাখতে পারেন নি। তিনি বংশগতি ব্যাখ্যা করতে লামার্কের ভুল অনুকল্পকেই গ্রহণ করে 'প্যানজিন' ধারণা হাজির করেন, পরবর্তীতে এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অরিজিন অব স্পিসিজ-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বইয়ের উপসংহারে সরাসরি 'ঈশ্বরকেই বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন'; যা তারমত নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘদিনের লব্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছুটা হলেও খাটো করে ফেলে। রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর দুর্বার চাপে তিনি আপোস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সারা জীবনই তিনি চেয়েছেন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে, ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে যাওয়া তার কখনোই উদ্দেশ্য ছিল না। এই ডারউইনই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উইলিয়াম প্যালের (১৭৪৩-১৮০৫) 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' প্রমাণের উদ্দেশ্যবাদী বক্তব্যকে (Teleological Argument) দক্ষতার সাথে খণ্ডন করেন। চোখের মত জটিল অঙ্গ

উদ্ভবের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আমেরিকার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ আসা গ্রে (১৮১০-১৮৮৮)-কে লেখা এক চিঠিতে নির্দ্বিধায় বলেন: "I see no necessity in the belief that the eye was expressly designed." মৃত্যুর তিন বছর আগে, ১৮৭৯ সালে লেখা এক চিঠিতে ঈশ্বর সম্পর্কিত নিজের অবস্থান খোলসা করেন এভাবে:

"In my most extreme fluctuations I have never been an Atheist in the sense of denying the existence of God. I think that generally (and more and more as I grow older), but not always, that an Agnostic would be the more correct description of my state of mind."(৪)

এক বছর পর (১৮৮০) ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী এডওয়ার্ড এ্যাভেলিং (Edward Aveling) "The Student's Darwin" নামের একটি বই লিখে ডারউইনকে উৎসর্গের জন্য চিঠি লিখে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। বইটি ছিল কট্টরভাবে ধর্মবিরোধী, র‍্যাডিকেল নাস্তিকতার ওপর লেখা। বইটির লেখক জীববিবর্তন তত্ত্ব দ্বারা ধর্মীয়ভাবনাকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডারউইন এডওয়ার্ডের এ ধরনের প্রচেষ্টায় রাজি হননি এবং তাঁকে অক্টোবরের ১৩ তারিখে (১৮৮০) চিঠি লিখে মত প্রকাশ করেছিলেন: "It appears to me (whether rightly or wrongly) that direct arguments against Christianity & theism produce hardly any effect on the public; & freedom of thought is best promoted by the gradual illumination men's minds which follo[s] from the advance of science. It has, therefore, been always my object to avoid writing on religion, & I have confined myself to science."শেষে নিজের সম্পর্কে বলেন: "I may, however, have been unduly biased by the pain which it would give some members of my family, if I aided in any way

direct attacks on religion.”: (দ্রষ্টব্যঃ Stephen Jay Gould, “A Darwinian Gentleman at Marx’s Funeral,” Natural History (September 1999)) এডওয়ার্ড এ্যাভেলিং হলেন কার্ল মার্কসের মেয়ে ইলানোর মার্কস (Elanor Marx)-এর স্বামী। ডারউইন সম্পর্কে এরকম একটি প্রচারণা রয়েছে: ‘মার্কস ব্যক্তিগতভাবে ডারউইনকে তাঁর দ্যাস ক্যাপিটাল বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠিয়েছিলেন এবং বইটি তিনি ডারউইনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডারউইন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মার্কসকে চিঠি লিখে না করেন।’ আসলে এডওয়ার্ডের স্ত্রী ইলানোর মার্কসের কাছে পিতা কার্ল মার্কসের লেখা যাবতীয় চিঠিপত্র, কাগজপত্র সংরক্ষিত ছিল। স্বামী এ্যাভেলিংকে লেখা ডারউইনের চিঠিও তাঁর কাছে ছিল। পরবর্তীতে লোকমুখে এ্যাভেলিংকে লেখা এই চিঠির কথাই ‘মার্কসকে লেখা ডারউইনের চিঠি’ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। আর ডারউইনের কাছে এক কপি দ্যাস ক্যাপিটাল ছিল ঠিকই, তবে ইংল্যান্ডের জীববিবর্তন-দার্শনিক মাইকেল রুজ (Machael Ruse) Darwinism Defended (Addition-Wesley Publ. Co, London, 1982) গ্রন্থে জানিয়েছেন: ‘ডারউইনের বাড়িতে গিয়ে তিনি দ্যাস ক্যাপিটাল বইটি সম্পূর্ণ অখোলা অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন।’ রুজের মতে, ‘ডারউইনের ‘জীবনের জন্য সংগ্রাম’কে যারা শ্রেণী সংগ্রামের সমার্থক মনে করতেন, তারা যে আদৌ ডারউইনের তত্ত্বকে বুঝতে পারেননি, তা ডারউইন ভালভাবেই জানতেন।’ তাই হয়তো তার জীববিবর্তন তত্ত্বকে মার্কসের সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্বে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিলেন না, হয়তো সম্ভব নয় বলেও মনে করতেন। যাহোক, ডারউইনকে বিচার করতে হলে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, খণ্ডিতভাবে বিচার করলে ডারউইনের প্রতি কোনোভাবেই ন্যায় বিচার করা হবে না।

এবার পূর্বের আলোচনায় যাই। বিজ্ঞান গবেষণা আর আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা আমেরিকার জনসাধারণের উপর পরিচালিত ঈশ্বর বিশ্বাস আর জীববিবর্তন তত্ত্বের প্রতি আস্থা নিয়ে বহু বছর ধরেই জরিপ হয়ে আসছে। এ রকম

কিছু জরিপের চুম্বক অংশ তুলে ধরা হল: ১৯৯৬ সালের জরিপ হতে জানা গেছে, আমেরিকার শতকরা ৩৯ ভাগ বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, ১৯৯৭ সালের আরেক জরিপ হতে দেখা যায় শতকরা ৯৯ ভাগ বিজ্ঞানীই জীববিবর্তন তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন; এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেমন রয়েছেন ধর্মবিশ্বাসী, তেমনি সংশয়বাদী, নিরীশ্বরবাদী। তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্থানে জীববিবর্তন তত্ত্ব কোনো অন্তরায় নয়। এবার আমেরিকার সাধারণ জনসাধারণের কিছুটা খবর নিই: ২০০১ সালের গ্যালআপ জরিপ হতে দেখা যাচ্ছে শতকরা ৪৫ ভাগ মনে করে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন বর্তমান কাঠামোতেই মাত্র ১০ হাজার বছর বা ঐ রকম কিছু বছর আগে। শতকরা ৩৭ ভাগ আমেরিকান মনে করে, খুব সরল অবস্থার জীবন থেকে মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে বিবর্তিত হয়ে এসেছে; এবং এ প্রক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন ঈশ্বর। মাত্র ১২ ভাগ মনে করে ঈশ্বরের কোনো ধরনের ভূমিকা ছাড়াই মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে বিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। ২০০৯ সালে ডারউইনের দ্বিশত জন্মবার্ষিকীর একদিন আগে প্রকাশিত গ্যালআপ জরিপ হতে জানা গেছে, শতকরা ৩৯ ভাগ আমেরিকান জনগণ জীববিবর্তন তত্ত্বে আস্থা রয়েছে। ২৫ ভাগ জনগণের জীববিবর্তন তত্ত্বে কোনো আস্থা নেই। অবশ্য শতকরা ৩৬ ভাগ কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেনি। এ জরিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন পাশের ওয়েব সাইট থেকে: http://www.gallup.com/poll/114544/darwin-birthday-believe-evolution.aspx ।

প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞানীরা যদি ধর্মবিশ্বাসী-অবিশ্বাসী হওয়ার পরও জীববিবর্তন তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেন জীবজগতের বাস্তবতা হিসেবে তবে সাধারণ মানুষ পারবে না কেন? এর কারণ বহুমাত্রিক। ছোট করে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা স্পষ্টই সমাজের প্রাগ্রসর পর্যায়ে রয়েছেন, জ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য নিমিষেই আহরণ করা তাদের জন্য মোটেও দুর্লভ বা অসম্ভব কিছু নয়। আর মেধা আর বুদ্ধির চর্চার কারণে কায়েমী শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতি তাদের সহজে মতান্ধ করতে পারে না।

পার্থিব জগতের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, গবেষণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক কোন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয় না। বিজ্ঞান মানবীয় আবেগ নিরপেক্ষ, গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সংঘাত ঐতিহাসিক কাল হতেই চলে আসছে। ধর্মের যুপকাষ্ঠে নির্যাতিত-নিগৃহীত হয়েছেন হাইপেশিয়া, ব্রুনো, গ্যালিলিওসহ কত শত মনীষী। 'অরিজিন অব স্পিসিজ', 'ডিসেন্ট অব ম্যান' গ্রন্থদ্বয় লেখার কারণে ডারউইনও কম নিগ্রহের শিকার হন নি। কিন্তু আজকের যুগের বাস্তবতা ভিন্ন। বিজ্ঞান এ যুগে মানুষের জীবনধারা, চিন্তার জগৎ এত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে যে, বিজ্ঞান ব্যতীত একটি দিন কল্পনা করাই দুরূহ। ফলে ধর্ম নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের সাথে আপোস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, 'বিজ্ঞানসম্মত' হয়ে ওঠার চেষ্টায় নিজের বিভিন্ন মতবাদ শুধরে নিচ্ছে। অর্থাৎ এ যুগে ধর্মবিশ্বাসের সাথে খাপ খায় না, কিংবা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী বলে বিজ্ঞানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বাদ দেয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা নিজের পায়ে কুড়াল মারার শামিল। জীববিবর্তন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান; ঔষধশিল্পে ব্যাকটেরিয়ার প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা, জৈবপ্রযুক্তি, আণবিক, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির মূল বিষয়ই হচ্ছে জীববিবর্তন তত্ত্ব। এমতাবস্থায় ধর্ম-বিরোধী অপবাদ দিয়ে জীববিবর্তন পাঠ ও গবেষণা বন্ধ রাখা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক কিছু বয়ে আনবে না।

উৎসনির্দেশঃ

(১) Robert M. Hazen, Genesis: The Scientific Quest for life's Origin, Joseph Henry Press, 2005.

(২) Theodosius, Dobzhansky, “Nothing is Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution”, American Biology Teacher 35(1973): 125-29.
(৩) F. S. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief (New York: Free Press, 2006), pp. 106-107
(৪) Letter to J. Fordyee reprinted in Gavin De Beer, “Further Unpublished Letters of Charles Darwin”, Annals of Science 14 (1958), p. 88.

অনন্ত বিজয় দাশ

(১৯৮২-২০১৫)

৩৩ বছরের অনন্ত বিজয় দাশ একটি ব্যাংকে কাজ করতেন। সেই সঙ্গে তিনি যুক্তি নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক এবং সিলেটের বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী সমিতির সংগঠক ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার উপর চারটি বই লিখেছিলেন এবং গণজাগরণ মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মুক্তমনা বাংলা ব্লগের একজন প্রশাসক ছিলেন তিনি; ব্লগটি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এপ্রিল ২০১৫ তে ডয়েচে ওয়েলের প্রখ্যাত ববস পুরষ্কার অর্জন করেছিল। মুক্তমনায় প্রধানত বিজ্ঞান এবং বিবর্তন নিয়েই লিখতেন কিন্তু ইসলাম এবং হিন্দুত্বের কিছু বিষয়ে তিনি ফেসবুক সহ একাধিক ব্লগেও লিখতেন।

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com